অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ • সংখ্যা-২৩ • বর্ষ-৬

বিজয় দিবস সংখ্যা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ • সংখ্যা-২৩ • বর্ষ-৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ : **মোস্তাফিজ কারিগর**

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

বিজয় দিবসের প্রত্যাশা : অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন

আকাশের নীল কপালে শেষবার সিঁদুর মাখিয়ে
সূর্য ডুবে গেলো
আরণ্যক পথ বেয়ে আমরা ক'জন
ফিরলাম নিভৃত ক্যাম্পে
ফিরলাম জখমী সাথীর দেহ কাঁধে বয়ে বয়ে
ক্লান্ত তবু বিজয়ের আনন্দে দৃপ্ত।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণমানুষের কবি বুলবুল খান মাহবুব এর যুদ্ধ দিনের এই আলোকিত পঙক্তিমালায় উঠে এসেছে ৭১ এর রণাঙ্গনের বাস্তব চিত্র। ভাষা পেয়েছে ভয়াবহ যুদ্ধের ঘটনা, জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং বিজয়ের আনন্দ উদ্ভাস।

সুদীর্ঘ সংগ্রাম-আন্দোলনের পথ পরিক্রমা শেষে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির জীবনে লাল সূর্য হিসেবে উদিত হয় ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তারপর বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা ও লাখো প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বিজয়। আর সেই বিজয় দিনের আনন্দ প্রতিবছরই অনুভব ও উপভোগ করে বাংলাদেশের মানুষ। এবারের বিজয় দিবস একটা অন্যরকম দ্যোতনা নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। এ বছর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মের শতবর্ষ উপলক্ষে পালিত হচ্ছে মুজিব জন্মশতবর্ষ এবং অন্যদিকে আগামী বছরের বিজয় দিবসটি হতে যাচ্ছে ৫০ তম বিজয় দিবস। জাতীয় জীবনে মহানন্দের এ এক বিস্ময় ক্ষণ।

এ জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের জনসভায় ঘোষণা দেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই আহ্বানেই এ দেশের মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় পরিপূর্ণ বিজয়। পরাধীনতা থেকে মুক্তির আনন্দে উজ্জীবিত হয় বাংলাদেশের মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব লাভ ও অর্থনৈতিক মুক্তিসহ বাক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। সেক্ষেত্রে আমরা মানচিত্র ও পতাকার স্বাধীনতা লাভ করলেও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সরকারের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো দারিদ্র্য বিমোচনসহ দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এতে করে গ্রাম ও শহরের এক বিশাল জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দ্বারা নিজেকে অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে দেশ আজ দরিদ্র অর্থনীতির কাতার থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের কাতারে ঠাঁই লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে বেড়েছে শিক্ষার হার, গড় আয়ু, মাথাপিছু আয়সহ ক্রয় ক্ষমতা। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই গ্রামে গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়াসহ নিজেদের অর্থায়নে বাংলাদেশ পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণে সক্ষম হচ্ছে। বলতে গেলে এই দু'দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র ও অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এক্ষেত্রে দেশের পোশাক শিল্প এবং জনশক্তি রপ্তানি খাতেরও ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১শ ৯০ কোটি টাকা। এতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)র পরিমাণ ২ লক্ষ ২ হাজার ৭শ ২১ কোটি টাকা। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রর রিজার্ভ ৪১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। সবই সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলে। শুধু তাই নয়, বিশ্বে এখন বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত।

কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ মহামারিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি এনজিও সেক্টরও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এমএফআই খাতে ২৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়েছিল। সরকার ইতোমধ্যে এ খাতে ৩ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ বরাদ্দ দিয়েছে। যা বিভিন্ন সংস্থা ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঋণ সহযোগিতা হিসেবে প্রদান করছে। পাশাপাশি এসএমই খাতে আরো ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড় করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

সম্প্রতি আমরা মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান, সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত এবং বুরো বাংলাদেশ এর সাধারণ পরিষদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদকে হারিয়েছি। প্রত্যয়ের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম, ক্ষুদ্রঋণ ও আজকের বাংলাদেশ

ড. আতিউর রহমান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না– প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন একজন মানবদরদী অর্থনীতিবিদ। তার চিন্তা চেতনায় ছিল দেশের আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এ দেশের কোনো মানুষ অভাবগ্রস্ত থাকবে না, প্রতিটি মানুষের শিক্ষা গ্রহণ ও স্বাস্থ্য চিকিৎসার সুযোগ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে, গড়ে উঠবে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। এ কারণেই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে ঐতিহাসিক মহাকাব্যিক ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন তার মূল কথাটি ছিল মুক্তি। এ মুক্তি শব্দটির ব্যঞ্জনা ছিল বহুমাত্রিক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল এই শব্দে। ৭১ সালে এ দেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল দরিদ্র ও হত দরিদ্র। দুবেলা দুমুঠো আহার, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুযোগবঞ্চিত। এ জন্যে তিনি তার বক্তৃতায় এই গরিব, দুঃখীদের ভাগ্যোন্নয়নের কথা বলতেন। আজ আমরা বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন বলতে গণমানুষের জীবনমানের উন্নতিকেই বেশি করে বুঝে থাকি।

তিনি যে রাষ্ট্রচিন্তা করতেন তার মূলে ছিল সাধারণ মানুষ ও তাদের কল্যাণ। তার মতো করে তিনি তাই বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার কথা বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিতে যুক্ত করেছিলেন। তার 'সমাজতন্ত্র' অন্য দেশ থেকে ধার করা নয়। এ সমাজতন্ত্রে কৃষক, শ্রমিক ও জ্ঞানী মানুষের প্রাধান্য লক্ষ করার মতো। বঙ্গবন্ধু আগাগোড়াই ছিলেন গণতান্ত্রিক। তাই তার দেয়া সংবিধানেও গণতন্ত্র গুরুত্ব পেয়েছে। জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের রূপরেখায় বৈষম্য কমিয়ে আনার কথা বললেও, সমবায় গড়ার রূপরেখা দিলেও জমির মালিকানা কেড়ে নিতে চাননি। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার গুরুত্ব বেশি দিলেও ব্যক্তি মালিকানায় বিনিয়োগের লাগাম শিথিল করতে শুরু করেছিলেন।

তিনি রাজনৈতিক জীবনের বড় অংশই গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে কৃষকের দুঃখ-কষ্ট স্বচোখে দেখতেন। শ্রমিকের দুঃখও তিনি জানার চেষ্টা করতেন। কী করে এ শোষিত মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যায় সে বিষয়ে তিনি নিরন্তর ভাবতেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব বাংলার মানুষের তেমন উপস্থিতি ছিল না বলে বঙ্গবন্ধু বরাবরই বাঙালির জন্য ন্যায়বিচারের কথা বলতেন। এ কারণে তিনি পাকিস্তানি এলিটদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হন। তাই সুযোগ পেলেই তাকে জেলে ভরা হতো। জেলে বসেও লিখতেন, বাঙালির মুক্তি নিয়ে ভাবতেন। এ অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসনের কোনো বিকল্প নেই বলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরপরই তিনি ঐতিহাসিক ছয়-দফা ঘোষণা করেন। এ ছয়-দফা মূলত বাঙালির মুক্তির সনদ। একপর্যায়ে তথাকথিত আগরতলা মামলার নাম করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় তার নামে। প্রধান আসামি করা হয়। উদ্দেশ্য ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শেষ করে দেয়া। জনগণ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে তাকে মুক্ত করেন। এরপর আইয়ুব সকারের পতন হয়। আসে আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া সরকার। নয়া সরকার জাতীয় নির্বাচন দিলে বঙ্গবন্ধু ছয়-দফার পক্ষে গণরায় নেয়ার অভিপ্রায়ে এ নির্বাচনে অংশ নেন। সারা দেশে নির্বাচনী প্রচারে বাঙালির বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। আগামী দিনের সংবিধানে যে ছয়-দফার প্রতিফলন ঘটানো হবে তাই পরিষ্কার করেন ভোটারদের কাছে। তাই বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় তার দল। প্রস্তুতিও নিতে থাকেন ছয়-দফাভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের। পাকিস্তানি শাসকদের নানা অত্যাচার ষড়যন্ত্র পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয় বাঙালির। পাকিস্তানে বন্দি থাকা জাতির পিতা মহানায়কের বেশে ফিরে আসেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে।

দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই বঙ্গবন্ধু শুরু করে দেন স্বদেশের পুনর্গঠন। পরিস্থিতির কারণেই শিল্প কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালনা করতে বাধ্য হন। তবে এসব কারখানার ব্যবস্থাপনা বোর্ডে ৪০ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিলগ্নিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেন। এ কথাও মনে রাখা চাই, অত্যন্ত বৈরী এক পরিবেশে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে তিনি পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণে হাত দিয়েছিলেন। অবকাঠামো ছিল খুবই নাজুক। বেশিরভাগ সড়ক, বন্দর, সেতু বিধ্বস্ত। শিল্প-কারখানাও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। উপর্যুপরি বন্যায় কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করা যায়নি। বহিঃঅর্থনীতিও খুব প্রতিকূল ছিল। বাহাত্তরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোনা থেকে ডলারে পরিবর্তন করার প্রথা তুলে নেয়। ফলে ৩ ডলারের এক ব্যারেল তেলের দাম হয়ে যায় ১১ ডলার। প্রতি টন গমের দাম ছিল আগে ৮০ ডলার। হয়ে যায় ২৪০ ডলার। সারের দাম ছিল প্রতি টন ৮০ ডলার। তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২০০ ডলার। সারা বিশ্বেই মূল্যস্ফীতি হয়ে যায় আকাশচুম্বী। বিদেশি সহায়তা পেতেও বেগ পেতে হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর শক্তিশালী নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে পুরনো ঋণের দায়-দেনার সমঝোতা হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি বৈরীই থেকে যায়। তাই অনেক কষ্টে তাকে খাদ্য সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে। ১৯৭৪ সালের মূল্যস্ফীতি ৬০ শতাংশকে ১৯৭৫ সালে ৩০-৩৫ শতাংশে নামিয়ে

আনতে পেরেছিলেন। মাত্র তিন বছরেই তিনি বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৯৩ ডলার থেকে টেনে ২৭১ ডলারে উন্নীত করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তাতেই প্রতিফলিত হয়েছিল তার গণমুখী আধুনিক অর্থনৈতিক দর্শন। আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার পাশাপাশি তিনি একটি ন্যায্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও প্রবক্তা ছিলেন। শোষিতের পক্ষেই ছিলেন বরাবর। তাই কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রে তাকে প্রাণ দিতে হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।

অনেক সংগ্রাম শেষে বাংলাদেশ ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পথে। তার কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মহামারীতে সেই গতি খানিকটা থমকে গেলেও অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভালোই করছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কন্যার হাত ধরে। এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে লড়াকু বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে সোনার বাংলার সন্ধানে। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কার মধ্যেই অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। যতটা জাঁকজমক-পূর্ণভাবে এ বছর মুজিববর্ষ পালন করার কথা ছিল মহামারীর কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ঠিকই অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ। এখন থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে বাঙালির ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি অন্তরের গহিনতম তল থেকে উচ্চারণ করেছিলেন 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। ঔপনিবেশিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত-নির্যাতিত বাঙালি জাতির পিতা সেদিন এমন সাহসী উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন এ ভূখণ্ডের মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য দীর্ঘদিনের আত্মত্যাগের ঐতিহ্যের বিষয়টি মাথায় রেখে। 'কারাগারের রোজনামচায়' তাই তিনি লিখেছেন, 'এই দেশের মানুষ তার ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য যখন জীবন দিতে শিখেছে তখন জয় হবেই, কেবলমাত্র সময় সাপেক্ষ।' (শেখ মুজিবুর রহমান, 'কারাগারের রোজনামচা', বাংলা একাডেমি, ২০১৮, সপ্তম মুদ্রণ, পৃ. ৭৩)। বাস্তবেও তাই হয়েছে।

সামষ্টিক উন্নয়নে যে অগ্রগতি আমরা বিগত যুগ ধরে অর্জন করছি তা কম নয়। মহামারী সত্ত্বেও তাই বাংলাদেশের অর্থনীতি থমকে যায়নি। বিশ্ব অর্থনীতি যখন ৫ শতাংশের বেশি হারে সংকুচিত হওয়ার পথে তখনও বাংলাদেশের অর্থনীতি ৬ শতাংশের বেশি হারে বাড়বে বলে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোই বলছে। বাংলাদেশের প্রক্ষেপণ অবশ্য এর চেয়ে অনেকটাই বেশি। এমন সংকটকালেও এই যে অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রমাণ রাখছে বাংলাদেশ এর উৎস খুঁজতে হবে তার নেতৃত্বের ও মানুষের লড়াকু মনের মাঝে। বাংলাদেশ এ মুহূর্তে করোনা মহামারী ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই সামনের দিকে এগোচ্ছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, গত পাঁচ দশকে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রা নানা বিচারেই বিস্ময়কর।

বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি সত্যি অনন্য। কী প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেই না বাংলাদেশকে আজকের এ অবস্থায় আসতে হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র আট বিলিয়ন ডলারের মতো। কী করে সেই অর্থনীতি ২০১৯ সালে ৩০২ বিলিয়নে উন্নিত হল- তা আসলেই অনুভবের বিষয়। অর্থাৎ এই পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বেড়েছে ৩৮ গুণের মতো। এই ২০০৯ সালেও আমাদের মোট জিডিপির আকার ছিল ১০২.৫ বিলিয়ন ডলার। মাত্র এক দশকেই তা বেড়েছে তিন গুণের মতো। অথচ এর আগের চল্লিশ বছরে প্রতি দশকে বাংলাদেশের জিডিপির আকার বেড়েছে মাত্র ১.৭৬ গুণ। পঁচাত্তর পরবর্তী দশকে প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৪ শতাংশ। তার পরের দশকে তা ছিল ৫.২ শতাংশ অথচ ২০০৭-০৮ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে গড়ে ৭ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। গত এক দশকে কৃষির পাশাপাশি শিল্প ও সার্ভিস

খাতের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। রফতানি বেড়েছে কয়েকগুণ। আর রেমিটেন্স আয় তো বেড়েছে অবিশ্বাস্য হারে। এখন মাসে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার করে প্রবাস আয় দেশে আসছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১৬.৩৫ মিলিয়ন ডলার। আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে হয়েছে ১৬ বিলিয়ন ডলার। হাজার গুণ বেশি। এ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে প্রবাস আয় বেড়েছে ৪১ শতাংশ। অর্থনীতির নিয়মানুযায়ীই জিডিপিতে কৃষির অবদান কমছে। আর বাড়ছে শিল্পের অবদান। তাও আবার কর্মসংস্থানী শিল্পের বিকাশ ঘটে চলেছে। ফলে বিপুলসংখ্যক নারীসহ গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান ঘটছে শিল্পে। খুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা কর্মসূচিগুলো ঠিকঠাক মতো বাস্তবায়ন করা গেলে আমাদের অর্থনীতির গতিধারা ইতিবাচকই থাকবে বলে আশা করা যায়। সে জন্য অবশ্য ডিজিটাল মনিটরিং এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংগঠনগুলোর মাঝে নীতি সমন্বয় ও সহজিকরণ অব্যাহত রাখতে হবে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের অভিযাত্রার সুফল আরও ভালোভাবে ধরা পড়বে কিছু দিন পর। আজকাল গ্রাম আর শহরের জীবনযাত্রা ও সুযোগ-সুবিধার তফাত খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। বিশেষ করে আমাদের অর্থনীতির মূল রক্ষাকবচ কৃষির উন্নতি সত্যি অসাধারণ। আর কৃষি ভালো করছে বলে ভোগ বাড়ছে। বাড়ছে মানুষের আয়-রোজগার। তাই চাহিদাও বাড়ছে। ফলে শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে। অন্যদিকে দেশের এনজিও/এমএফআই সেক্টরও জাতীয় উন্নয়নের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গের মতোই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা, বিকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষার বিস্তৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এনজিও সেক্টরের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নকামী দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষগুলো এ খাতের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠছে। এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এনজিও খাত শুধু যে দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করছে তাই নয়, গ্রাম অর্থনীতিকে শক্ত ভিত দিচ্ছে। বাংলাদেশ এই যে দরিদ্র অর্থনীতির রেশ কাটিয়ে মধ্যম আয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এর পেছনে এনজিও/এমএফআই খাতের অবদান অনেক। শুধু এনজিও খাত নয়, ব্যাংকগুলোও কৃষি ঋণ, এসএমই ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির এই চাঙ্গা ভাবের কারণে এ করোনাকালেও আমাদের প্রবৃদ্ধির হার পৃথিবীর ষষ্ঠতম সেরা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবৃদ্ধির দৌড়ে আমরাই প্রথম।

জাতির পিতা যে প্রাণবন্ত আর সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন তার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে সফল হওয়ার সংস্কৃতি। তাই আমরা জাতীয় উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণের লড়াইয়ে সাহস পাচ্ছি। আমরা যে পারি তার প্রমাণ তো পদ্মা সেতুর সর্বশেষ স্প্যানটির দৃশ্যমান করার মাধ্যমেই দেখিয়েছি। এমনই বাস্তবতায় আমাদের আশা আমাদের সরকার, ব্যক্তি খাত ও বেসরকারি সংগঠনগুলো সমন্বিত উপায়ে মানুষের ওপর বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার উপর তারা বিনিয়োগ বাড়িয়ে যাবে। কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। কার্বন নিঃসরণ কমাতে সবুজ বিদ্যুতের ওপর জোর দিতে হবে। এভাবে এগোলে নিশ্চয় আমরা শত প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাব।■

● সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল ▮ কাদেরিয়া বাহিনী

ফেরদৌস সালাম

বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় অধ্যায় হচ্ছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জন। বাঙালি জনগোষ্ঠী হাজার হাজার বছরের মধ্যে খুব কম সময়ই স্বাধীন থাকার সুযোগ পেয়েছে। প্রায় প্রতিবারই এদেশ বহিঃশক্তির রাজন্য কিংবা আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা পরাধীন, শোষিত ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো টাঙ্গাইলেও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে। মধুপুর অঞ্চলের ফকির সন্ন্যাস বিদ্রোহ এর অন্যতম উদাহরণ। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনেও টাঙ্গাইলের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। বৃটিশের আধিপত্য থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠায়ও টাঙ্গাইলের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মওলানা ভাসানী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, স্যার আবদুল হালিম গজনবী, স্যার আবদুল করিম গজনবী, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, সুবল ব্যানার্জি, মৌলভী আব্দুর রাহিম ইছাপুরীসহ অনেকেই সে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। খেলাফত আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন, ফরাজী আন্দোলনেও টাঙ্গাইল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহেও টাঙ্গাইলের যোদ্ধারা অংশ নিয়েছিলেন। এরপর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার হলেন, সেই স্বৈরাচারি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও টাঙ্গাইলের ভূমিকা বিশাল। ভাষা আন্দোলন, বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক স্বায়ত্ব শাসনের আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে টাঙ্গাইল হয়ে উঠেছিল এক আগ্নেয়গিরি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম

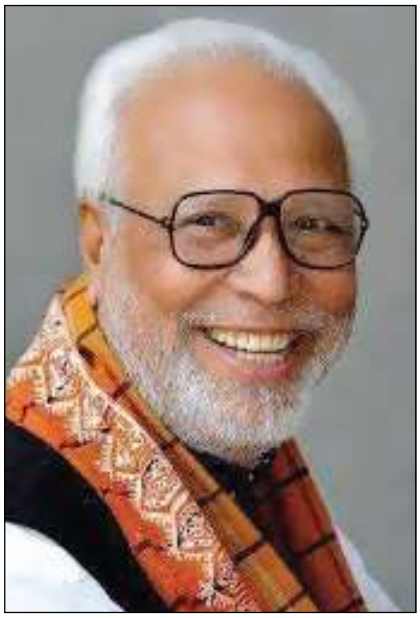

সূতিকাগার ছিল এই টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। শুধু মানুষ নয় এখানকার মাটিও হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে– জয়ভাগ্য ছিনিয়ে আনতে হয়েছে অদম্য দুর্বার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিটি দেশপ্রেমিক সদস্য এ কৃতিত্বের দাবিদার।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান ও ভারত প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গ এবং এখানকার নেতৃবৃন্দ ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও শুরু মুহূর্তেই শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করে। তাদের বৈরি আচরণ উপলব্ধি করেই মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীই প্রথম প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তার নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক হন শামসুল হক। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। মওলানা ভাসানীর জন্মস্থান সিরাজগঞ্জ হলেও বৃটিশ আমল থেকেই তার রাজনৈতিক কার্যক্রম টাঙ্গাইলস্থ বসতভিটা সন্তোষকে ঘিরে। মওলানা ভাসানী এবং শামসুল

হক দু'জনের বাড়িই টাঙ্গাইল। ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ পাকিস্তানের এক দুর্বার বিরোধী দলে পরিণত হয়। ৫৪'র নির্বাচনে এই দলের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক বিজয় লাভের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে জাতীয় ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সামনে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে স্পষ্ট বলে দেন 'ওয়ালায়কুম সালাম'। বলে দেন– তোমরা তোমাদের মতো করে চলো, আমরা তোমাদের কর্তৃত্ব মানবো না, নিজেদের মতো করে চলবো। এটি ছিল এ দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক সূচনাময় ইঙ্গিত।

পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানি সামরিক সরকার যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে ঝুলানোর আয়োজন চূড়ান্ত করেছিল, তখনও এ জাতির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার মওলানা ভাসানী তার বিরুদ্ধে সোচ্চার গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ভাসানীর অনুসারী ছাত্রনেতা আসাদ ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ গণঅভ্যুত্থান। মওলানা ভাসানী হুঙ্কার দেন 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো।' গণঅভ্যুত্থানে ৬৯ এর ২৫ মার্চ আইয়ুব শাহীর পতন ঘটে এবং সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা কারাবন্দী থাকায় টাঙ্গাইলের জননেতা আব্দুল মান্নান দলের কেন্দ্রের নেতৃত্বে থেকে সরকারবিরোধী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভাসানী ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে 'প্রহসন' আখ্যা দিয়ে নির্বাচন বর্জন করেন। ভাসানীপন্থীদের স্লোগান ছিল– ভোট বাক্সে লাথি মারো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো। বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান টালবাহানা শুরু করলে তিনি ৯ মার্চ পল্টনের জনসভায় স্পষ্ট ভাষায় শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও বাংলার স্বাধিকারের দাবি মেনে নেয়ার জন্য ইয়াহিয়ার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। অবশ্য এর আগে থেকেই একদফা দাবি স্বাধীনতার জন্য সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৭১-এর ২ মার্চ স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন এবং ৩ মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠে নেতৃত্ব দেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শীর্ষনেতা, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক টাঙ্গাইলের শাজাহান সিরাজ। এছাড়া মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক সহকর্মী মুরিদানরাও তার নির্দেশে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ দানের সমাবেশেও টাঙ্গাইলের নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২৫ মার্চ ঢাকায় পাকবাহিনী নিরপরাধ বাঙালির উপর গণহত্যা শুরুর বেশ আগেই টাঙ্গাইলে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু হয় যার যা ছিল তা নিয়েই। এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত টাঙ্গাইলের জাতীয় পরিষদ সদস্য আব্দুল মান্নান, প্রিন্সিপাল হুমায়ুন খালিদ, শামসুর রহমান খান শাজাহান, হাতেম আলী তালুকদার এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডা. শেখ নিজামুল ইসলাম, বদিউজ্জামান খান, আব্দুল বাসেত সিদ্দিকী, আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল, সেতাব আলী খান, ফজলুর রহমান খান ফারুক ও মো. শামসুদ্দীন আহমদ এবং টাঙ্গাইল আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। একই সাথে জেলার বিভিন্ন স্থানে অবসরপ্রাপ্ত আর্মি, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবী যুব-তরুণদের সংগঠিত করে যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি এনায়েত করিম এবং সাধারণ সম্পাদক কাদের সিদ্দিকী যেহেতু একসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে চাকরি করেছেন, স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাঁদের উপরই বর্তায়।

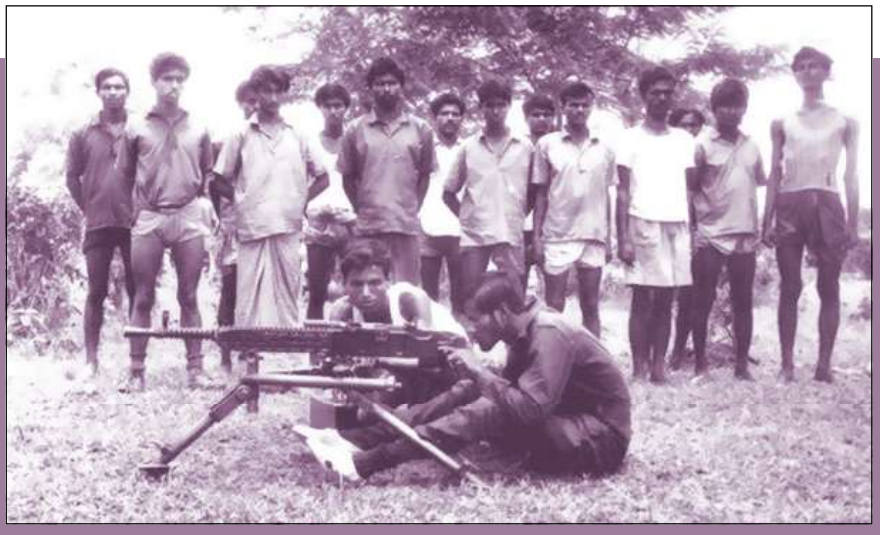

২৫ মার্চ টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বদিউজ্জামান খানকে চেয়ারম্যান ও আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীকে আহ্বায়ক ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে সর্বদলীয় স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ গঠন করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা করা হয় পাকিস্তান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডিফ্যাক্টো করা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খন্দকার আসাদুজ্জামানকে। কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন– জাতীয় পরিষদের সকল সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদের সকল সদস্য, সৈয়দ আবদুল মতিন (ভাসানী ন্যাপ) আল মুজাহিদী (জাতীয় লীগ), আনোয়ার উল আলম শহীদ, আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম, হবিবর রহমান খান (মোটর শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন) এডভোকেট নুরুল ইসলাম, আলী আকবর খান খোকা, বীরেন্দ্র কুমার সাহা, নঈম উদ্দিন মোক্তার ও হামিদুল হক মোহন।

এপ্রিলের শুরুতে পাকবাহিনী টাঙ্গাইল অভিমুখে যাত্রা করলে গোড়াই সাটিয়াচড়ায় এমপি ফজলুর রহমান খান ফারুকের নেতৃত্বে পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগকারী ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও ছাত্র যুবকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এখানে যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। এক পর্যায়ে প্রতিরোধকারীরা পরাজিত হলে পাকবাহিনী টাঙ্গাইল প্রবেশ করে। এই যুদ্ধে ইপিআর বাহিনীর ২৫ জনসহ প্রায় ৩০/৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এই শহীদদের মধ্যে ইপিআর সদস্য ফরিদপুরের আব্দুল গফুর ও ইপিআর সদস্য বগুড়ার হাবিলদার আব্দুল খালেক, গোরানের আবুল কাশেম, ছাত্রনেতা জুমারত হোসেন, জাহাঙ্গীর ও দুদু উল্লেখযোগ্য। ৭/৮ ঘণ্টা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে এলে হানাদার বাহিনী গোড়ান-সাটিয়াচড়া গ্রামে ঢুকে শত শত মানুষকে হত্যা করে। দুঃখজনক বিষয়, এখানকার শহীদ ৫ ইপিআর এর কবর ব্যতিরেকে গণকবরগুলো এখন নিশ্চিহ্ন। এখানে শহীদের তালিকায় স্মৃতিসৌধে ১৪২ জনের নাম রয়েছে। অনেক শহীদ পরিবারই সরকারি সাহায্য কিংবা স্বীকৃতি পায়নি।

পাকবাহিনী টাঙ্গাইল প্রবেশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড এই সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো।

যুদ্ধের নেতৃত্বে কাদের সিদ্দিকী

শুরুতে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেও সার্কিট হাউজ অপারেশনের ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে আবির্ভূত হন কাদের সিদ্দিকী। গোড়ান-সাটিয়াচড়ায় প্রতিরোধ যুদ্ধে টিকে থাকা অসম্ভব হলে কাদের সিদ্দিকী সাটিয়াচড়ার ডিফেন্স উঠিয়ে সহযোদ্ধাদেরসহ টাঙ্গাইল চলে আসেন। এরপর তিনি পুলিশ ক্যাম্পের দরোজা খুলে ৩০৩

রাইফেলের ৩০/৩৫ হাজার, ৯ এমএম এর ৫০০০ এর মতো গুলি, ৭০টি ৩০৩ রাইফেল, ২০টি একনলা/দো-নলা বন্দুক, ৩০টির মতো ডামি রাইফেল ট্রাকে তুলে সখীপুর পাহাড়ের দিকে চলে যান। সেই সাথে ৪ বস্তা আটা, ২ বস্তা চিড়া, ১ বস্তা চিনি, ৮/১০ টিন বিস্কুট নেন। নেতৃত্বের যোগ্যতা, অসীম সাহস ও রণকৌশল দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে তিনি কিংবদন্তী গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত হন। কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বগুণেই মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ সফলতা যমুনার মাটিকাটায় ঐতিহাসিক জাহাজ দখল, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জব্দসহ টাঙ্গাইল-এর এক বিশাল এলাকা মুক্ত রাখা সম্ভব হয়। তার সুদক্ষ নেতৃত্বে ১৭ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী ও ৭২ হাজারেরও অধিক সদস্যের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে ওঠে– যা নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু দেশেই নয়, কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যরা ভারতেও ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধে অংশ নেন।

কাদের সিদ্দিকীর প্রথম আগুন, প্রথম মৃত্যুদণ্ড

৭১ এর এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে ছাত্রনেতা আব্দুল কাদের সিদ্দিকী তার কয়েকজন সহকর্মীসহ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ঘাটাইল উপজেলাধীন পাহাড়িয়া অঞ্চল দেওপাড়ার দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে তিনি জানতে পারেন ভাবনদত্ত গ্রামের ফালু খাঁর ছেলে তখনো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গাড়ি চালকের দায়িত্ব পালন করছে। ফালু খাঁর ছেলে ধনবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর বাড়ি থেকে কয়েকটি দামী চেয়ার লুট করে নিয়ে আসে। সেই চেয়ারে আরাম করে বসে ফালু খাঁ দেলুটিয়া বাজারের হাটুরেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানায় যে, এটা ধনবাড়ির নবাব বাড়ির চেয়ার। আমার ছেলেকে এগুলো পাকবাহিনীর এক অফিসার দিয়েছে। দেখো আমার ছেলে আমাকে নবাব বানিয়ে দিয়েছে। একথা শোনার পর কাদের সিদ্দিকী সিদ্ধান্ত নেন যে, পাক বাহিনীর এই দালালকে শাস্তি দিতে হবে। ফালু খাঁ তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হলেও তিনি তার সহকর্মীদের নিয়ে এই বাড়িতে আগুন দেন। ফালু খাঁ পালিয়ে যায়। হানাদারদের সহযোগিতাকারীদের বিরুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর এটাই ছিল প্রথম আগুন দেয়ার ঘটনা। এতে করে পাকিস্তানপ্রেমীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়।

এরপর ঘোড়ামারা পাঞ্জর চালার এক আদিবাসী মান্দাইয়ের বাড়িতে ডাকাতি হয়। মান্দাই নিজেও গরিব। ডাকাতরা তার বাড়ি থেকে ৫০০ টাকা এবং আটআনি স্বর্ণ নিয়ে যায়। ডাকাত দলের ৪ জন মুখোশ পড়া থাকলেও লম্বা মতো ডাকাত সর্দারকে চিনতে কষ্ট হয় না ভুক্তভোগীদের। তারা দেওপাড়া গিয়ে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কাদের সিদ্দিকীর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। কাদের সিদ্দিকী মুহূর্তেই গ্রাম্য ছিঁচকে ডাকাত উমেদ আলীকে ধরে আনেন। উমেদ আলী ডাকাতির কথা স্বীকার করে। কাদের সিদ্দিকী তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। গুলি করে মৃত্যুর পরিবর্তে কাদের সিদ্দিকী তাকে পিটিয়ে ও বেয়নেট দ্বারা খুঁচিয়ে হত্যার নির্দেশনা জারি করেন।

কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমাদের কাছে একটি গুলির দাম অনেক বেশি। কারণ, যুদ্ধে একটি গুলি একজন হানাদারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করাই শ্রেয়। পাহাড়ের পাদদেশে উমেদ আলীকে হত্যা করে লাশ বিলে ফেলে দেয়া হয়। মুক্তিবাহিনী তাকে হত্যা করায় কেউ এই লাশ তুলে কবর দেয়ার সাহস পায়নি। দু-তিন দিন পর লাশ পচে গন্ধ ছড়াতে থাকলে উমেদ আলীর পৈতৃক গ্রাম বারইপাড়ার আত্মীয়-স্বজনরা কাদের সিদ্দিকীর নিকট লাশটি কবর দেয়ার অনুমতি চান। অনুমতি নিয়ে তাকে কবর দেয়া হয়।

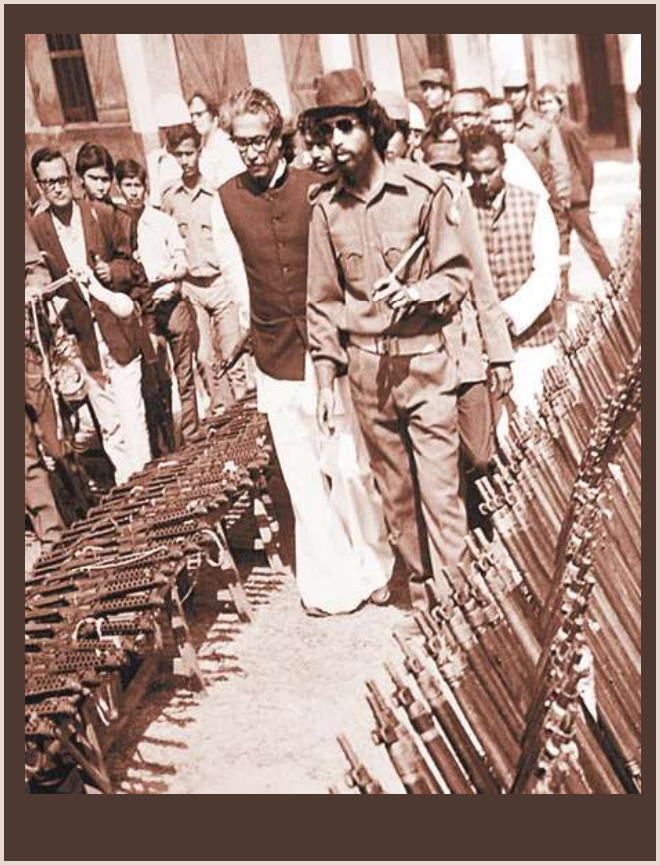

যুবকদের যুদ্ধে যাবার আহ্বান

ভাবনদত্ত ফালু খাঁর বাড়িতে আগুন দিয়ে পাহাড়ের দিকে যাবার মুহূর্তে তিনি দেখতে পান বারইপাড়া মেঘু শিকদারের পুকুরপাড়ে বেশ কিছু যুবক তাস পেটাচ্ছে। তিনি সেখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং বন্দুকের বাট দিয়ে দু'জনকে মৃদু আঘাত করে বলেন, দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে আর তোমরা তাস খেলছো–ছি! যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধ। বলে তিনি স্থান ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, এ ঘটনাটি লেখকের সম্মুখেই ঘটে। পরবর্তীতে এই গ্রাম থেকে ১১ জন মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জব্বার মিয়ার (পরে চেয়ারম্যান) নেতৃত্বে এ গ্রামটি মুক্তিবাহিনীর দুর্গে পরিণত হয়। বাড়িতে ৫০ জনের ১ প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা ৩ মাসের বেশি ক্যাম্প করে থাকে। এ কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন লোকমান ও প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন তোফাজ্জল।

কাদের সিদ্দিকী শুরুতে দেওপাড়া ও শোলাকিপাড়ায় কিছুদিন থাকার পর তার সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি সখীপুরের বহেরাতৈলে নিরাপদ এলাকায় হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করতে থাকেন।

যুদ্ধের সময় চুরি ডাকাতি বন্ধ হয়ে যায়

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিবাহিনী কর্তৃক দালালের বাড়িতে আগুন দেয়া এবং ছিঁচকে ডাকাত উমেদ আলীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার খবর গ্রামে গ্রামে, অঞ্চলে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিবাহিনীর ভয়ে চোর ডাকাতরা আর অপরাধ করার সাহস পায়নি।

সে সময় মুক্তিবাহিনীর আরেকটি ঘটনা বেশ সচেতনতা সৃষ্টি করে। সেটি হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা হাটের রাস্তায় ১০০ কিংবা ৫০০ টাকার কয়েকটি নোট ফেলে রেখে লুকিয়ে থাকতো। কেউ তা কুড়িয়ে হাতে নিলেই মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা তাকে বেদম প্রহার করতো। এরকম দু'একটি ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ার পর রাস্তায় সোনা পড়ে থাকলেও কেউ তা ভয়ে স্পর্শ করতো না। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময়গুলোতে টাঙ্গাইলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল চুরি ডাকাতি মুক্ত।

মুক্তিবাহিনীতে যোগদান

জুন মাস থেকে সরাসরি মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা

ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এলাকায় এলাকায় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এতে করে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে এই সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১৭ হাজারে উন্নীত হয়। একইসাথে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭২ হাজারে। টাঙ্গাইলের গ্রামাঞ্চলগুলোতে মুক্তিবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং জনগণের ব্যাপক সমর্থন থাকায় দালাল রাজাকারদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। এমনকি গ্রাম এলাকায় তাদের অবস্থান শুধুমাত্র হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় অথবা টাঙ্গাইল শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কাদেরিয়া বাহিনীর তৎপরতায় টাঙ্গাইলসহ ময়মনসিংহ, পাবনা ও মানিকগঞ্জের বেশ কিছু এলাকা মুক্তাঞ্চল হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

টাঙ্গাইল মুক্ত : ভারতীয় ছত্রী সেনা

১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মুক্ত এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হানাদারমুক্ত থাকায় ভারতীয় ছত্রীসেনারা নিরাপদে টাঙ্গাইলে অবতরণ করে। ভারতীয় ছত্রীসেনারা টাঙ্গাইলের কালিহাতি মহাসড়ক সংলগ্ন এলাকায় অবতরণের কারণেই তারা কাদের সিদ্দিকীর সহায়তায় অতি দ্রুত ঢাকায় পৌঁছতে সক্ষম হয়।

অন্যথায় যশোর হয়ে আসতে চাইলে যুদ্ধ সময় বেড়ে যেতে পারতো কিংবা হানাদার বাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হতো। ভারতীয় ছত্রীসেনা টাঙ্গাইলে অবতরণ করলে কাদেরিয়া বাহিনী তাদের নিয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে প্রথম উপস্থিত হন এবং একাধিক যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করেন। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে তারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে উপস্থিত হয়। সেখানে পাকবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক মেজর জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর দপ্তরে নাগরার সাথে কাদের সিদ্দিকীও উপস্থিত ছিলেন। এরপর পল্টন ময়দানে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বেই মুক্ত বাংলাদেশে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবাসী সরকারে টাঙ্গাইল

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১০ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হলে জননেতা আব্দুল মান্নান প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের পক্ষে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আমবাগানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান তাঁর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালিত হয় এবং তার সুযোগ্য পরিচালনায় সেই বেতার কেন্দ্র প্রচার যুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। তিনি আহমদ রফিক ছদ্মনামে 'জয় বাংলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ, কুলসুম জামান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। খন্দকার আসাদুজ্জামান প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অর্থসচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় '৭১-এর ১৬ এপ্রিল মওলানা ভাসানী যমুনা নদী পথে ভারতের আসাম সীমান্তে উপস্থিত হন। এর আগে ৫ এপ্রিল বিন্নাফেরে তিনি বুলবুল খান মাহবুবসহ দলীয় সকলকে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মওলানা ভাসানীকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সরকার পরিচালনায় সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান, চীনসহ বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়ে উদ্যোগ নেন।

প্রবাসে আবু সাঈদ চৌধুরী

প্রবাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন টাঙ্গাইলের আরেক কৃতি সন্তান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর আবু সাঈদ চৌধুরী তখন জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশন উপলক্ষে জেনেভায় অবস্থান করছিলেন। ২৫ মার্চ ঢাকায় গণহত্যার খবর শুনে তিনি অতিদ্রুত লন্ডন আগমন করে ভিসির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ এবং পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরপর স্বপ্রণোদিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ দেশসহ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে স্বীকৃতি ও সহযোগিতা আদায়ে তৎপরতা চালান। তাঁকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ, শামসুর রহমান খান, ফজলুর রহমান খান ফারুক, ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ এবং শরণার্থী শিবিরে দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও সেবা কার্যক্রমে ব্যাপক অবদান রাখেন। আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী কোনো কোনো সময় সশস্ত্র যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আব্দুল বাসেত সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের মুক্তাঞ্চলে অবস্থান করে সশস্ত্র যুদ্ধে সহযোগিতা ও বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করেন। টাঙ্গাইল জেলার কৃতী সন্তান পপস্মাট আজম খান সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেন কবি রফিক আজাদ, কবি আল মুজাহিদী, কবি বুলবুল খান মাহবুব, কবি মাহবুব সাদিক ও অন্যান্যরা। কবি সাযযাদ কাদির পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে কারা নির্যাতন ভোগ করেন।

পাকবাহিনীর মতো একটি প্রশিক্ষিত দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে দেশের কেন্দ্রস্থল টাঙ্গাইলে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখা ছিল সত্যিকার অর্থেই কঠিন চ্যালেঞ্জ। এটা সম্ভব হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন যুদ্ধে জয়, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে। ১৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও প্রায় ৭২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সমন্বিত বিশাল কাদেরিয়া বাহিনীর সমন্বয়ে জনগণের সহায়তায় টাঙ্গাইলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হানাদারমুক্ত ছিল। বিশেষ করে কাদের সিদ্দিকীর দক্ষ ও কৌশলী নেতৃত্বে সখীপুর বহেরাতৈলের বনভূমি ও যমুনার চরাঞ্চলের এক ব্যাপক অঞ্চল যুদ্ধকালে মুক্তাঞ্চল ছিল। কাদের সিদ্দিকী মাকড়াইর যুদ্ধে আহত হলে পাকিস্তানি হানাদাররা প্রচার করে যে তিনি নিহত হয়েছেন।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

আবদুল মান্নান

আবদুল লতিফ সিদ্দিকী

শাজাহান সিরাজ

পরবর্তীতে কাদের সিদ্দিকী তার প্রচারপত্রে লিখেন 'কাদের সিদ্দিকী ধলাপাড়া-মাকড়াইর যুদ্ধে মারা গেছে, এখন যে বেঁচে আছে সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নির্দেশ।'

সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করলেও দেশের অভ্যন্তরে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ-সিরাজগঞ্জ চরাঞ্চল ও ঢাকা পর্যন্ত বনাঞ্চলে কাদেরিয়া বাহিনীর যোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে হানাদারদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখে এবং কখনো কখনো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। কাদেরিয়া বাহিনী ছোট-বড় ৩০০ থেকে ৩৫০ এর অধিক যুদ্ধ পরিচালনা করে। বাহিনী প্রধান কাদের সিদ্দিকী নিজে ৪০টির অধিক যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

শোলাকিপাড়া যুদ্ধ

এই যুদ্ধে বাসাইল থানার ময়থার বদিউজ্জামান তোতা আহত হন– যাকে লেখক ও অন্য ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক সদস্য স্ট্রেচারে করে লেখকদের বারইপাড়ার বাড়িতে আনেন। এখানে তার চাচা ডা. আজমত আলী তাকে প্রায় ২ মাস চিকিৎসা করেন। অন্যদিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে চলাচলকারী হানাদার বাহিনীর গাড়িতে গেরিলা কায়দায় আক্রমণের ঘটনায় শত্রুরা প্রতিনিয়ত ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো।

একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বিশ্বের গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাসে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ নানাদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত কম ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র, যুবক, কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতীদের অংশগ্রহণে গঠিত গেরিলা যোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল।

জানবাজ গ্রুপ গঠন

টাঙ্গাইল শহরের আবুল কালাম আজাদ বীর বিক্রম ও নজরুল ইসলাম বাকুর (পরে শহীদ) নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি জানবাজ গ্রুপ গঠন করা হয়েছিল গ্রেনেড সাপ্লাই ও শহরে পাকসেনাদের উপর নিয়মিত হামলার উদ্দেশ্যে। পাকসেনা ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে গ্রেনেড চার্জ করা হতো। রূপবানী হলে 'রোড টু সোয়াত' চলা অবস্থায় এই সিনেমা বন্ধ করতে মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল হক খান মেনু হলে গ্রেনেড হামলা চালান। এতে বেশ ক'জন হতাহত হয়। টাঙ্গাইলের জামায়াতে ইসলামীর আমির খালেক প্রফেসরের বাসার সামনেও বেশ কয়েকবার গ্রেনেড চার্জ করা হয়। শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের এই ধরনের আক্রমণে হানাদার বাহিনী খুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই গ্রুপের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে খন্দকার আব্দুল আলম স্বপন, আব্দুল হামিদ বাবলু, মিলু ও জাকির হোসেন (বুরো বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক) অন্যতম। জাকির হোসেনদের আমঘাট রোডস্থ বাসায় মুক্তিবাহিনী অস্ত্র ও গ্রেনেড লুকিয়ে রাখতো।

বুলবুল খান মাহবুবের নেতৃত্বে বিপ্লবী হাই কমান্ড

মওলানা ভাসানীর সাহচর্যে এসে বাংলার রবিন হুড নামে পরিচিত একসময়কার যমুনা চর এলাকার ভয়ানক ডাকাত সর্দার কছিমউদ্দিন দেওয়ান ডাকাতি পেশা ছেড়ে দেন এবং কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি হন। মওলানা ভাসানীর নির্দেশে তিনিও বুলবুল খান মাহবুবের নেতৃত্বে বিপ্লবী হাই কমান্ডে যুক্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

এ দলটিতে এস এম রেজা, রফিকুল ইসলাম তারা, আব্দুল মালেক, শফিকুল ইসলাম সোনা প্রমুখ সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। আতিকুর রহমান সালু ও হাজেরা সুলতানা নরসিংদীর শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার এলাকায় যুদ্ধে অংশ নেন। এই দলটি শুরুর দিকে শাহজানির চর এলাকায় কাশবনে লুকিয়ে থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি লঞ্চ গুলি করে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধ ছিল বিপ্লবী হাইকমান্ডের প্রথম যুদ্ধ। পরে তারা চৌহালী থানা আক্রমণ করে বেশকিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখলে নেয়। ভূয়াপুর থানা আক্রমণকালে সিরাজগঞ্জের এসডিও শামসুদ্দিন অস্ত্র ও লোকবল দিয়ে সহযোগিতা করেন।

কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বুলবুল খান মাহবুব

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে কাদের সিদ্দিকীর আহ্বানে বুলবুল খান মাহবুব বিপ্লবী হাই কমান্ড বিলুপ্ত করে সদস্যদেরসহ কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিবাহিনীতে যুক্ত হন এবং ভূয়াপুর এলাকার মুক্তিবাহিনীর প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। বুলবুল খান মাহবুব ও এনায়েত করিম ভূয়াপুর অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

যমুনার চরাঞ্চলে মওলানা ভাসানীর সমর্থক বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি টাঙ্গাইলের সন্তান নূর মোহাম্মদ খান ও হামিদুল হক মোহনের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ পাবনা অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিল। এই গ্রুপটি মূলত: কমিউনিস্ট নেতা ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন এর দলের সাথে যুক্ত ছিল।

টাঙ্গাইল কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান ছিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ এবং প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব পান আবু মো. এনায়েত করিম। সখীপুরের গভীর অরণ্যে বহেরাতলি ও মহানন্দপুরে এবং পরে গভীর জঙ্গল আন্ধিতে এই প্রশাসনের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। এই বেসামরিক প্রশাসনকে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক বরাবর পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল দুটি জোনে ভাগ করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয় ভূয়াপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে। বেসামরিক প্রশাসনের কার্যক্রম ছিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে বুলবুল খান মাহবুব, এনায়েত করিম, নুরুল ইসলাম এবং মোয়াজ্জেম হোসেন খান যুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন। কাদের সিদ্দিকীর নির্দেশে পরে এ এম এনায়েত করিম ও নুরুল ইসলামকে ভারতে অবস্থান করে কাদেরিয়া বাহিনীকে ট্রেনিং ও অস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। মুক্তাঞ্চলের আপামর জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, ডাকাত দমন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখা, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা হাট-বাজার পরিচালনা, ভূমি হস্তান্তর, সড়ক ও নৌপথ নিয়ন্ত্রণ, বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রির জন্য কাজী নিয়োগ, কর আদায়, বিচার

পরিচালনা, গণ দুশমন ও দুষ্কৃতকারীদের নিয়ন্ত্রণ, গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান, জেলখানা পরিচালনা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও হাসপাতাল পরিচালনা, জনসংযোগ ও জনসভা অনুষ্ঠান, গোয়েন্দা বিভাগ পরিচালনা, যুদ্ধ পরিকল্পনা, অস্ত্র সংগ্রহ, প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ, কাদেরিয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে 'রণাঙ্গন' নামের সাইক্লোস্টাইল মেশিনে পত্রিকা প্রকাশ, বুলেটিন প্রচারপত্র মুদ্রণ ও বিলি করা, পাকবাহিনীর সাথে বন্দি বিনিময় ইত্যাদি কাজ পরিচালিত হতো। বেসামরিক প্রশাসনে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আব্দুল বাসেত সিদ্দিকী ছাড়াও আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, কবি বুলবুল খান মাহবুব, কবি রফিক আজাদ, কবি মাহবুব সাদিক, কবি আল মুজাহিদী, আজিজ বাঙ্গাল (ভূয়াপুর), নজরুল ইসলাম (বল্লা), হামিদুল হক (সখীপুর), মো. সোহরাওয়ার্দী (টাঙ্গাইল), সোহরাব আলী খান আরজু, মো. নূরুন্নবী (গোপালপুর), ফারুক (টাঙ্গাইল), আনোয়ার হোসেন (টাঙ্গাইল), আবু হোসেন (বাসাইল), এম এ লতিফ সিদ্দিকী (ঘাটাইল), আবু বকর সিদ্দিকী (সখীপুর), খোদাবক্স (ভূয়াপুর), আব্দুল হামিদ ভোলা (ভূয়াপুর), সৈয়দ নূরুল ইসলাম (গোলড়া)।

মেডিক্যাল বিভাগে ডা. শাহজাদা চৌধুরী, ডা. আমজাদ হোসেন, ডা. সালাহউদ্দীন, ডা. বিশ্বনাথ সরকার (মির্জাপুর), ডা. নূরুল ইসলাম (এলেঙ্গা), ডা. বাসুদেব (কালিহাতী), ডা. হরিদাস রায় (টাঙ্গাইল), ডা. রঞ্জু চৌধুরী (বাসাইল) প্রমুখ দায়িত্ব পালন করেন। ঔষধ, মেডিকেল সরঞ্জাম, রণাঙ্গন পত্রিকার কাগজ-কালি সংগ্রহে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন অবাঙালি মমতাজ আলী খান পাঠান। তবে সামরিক-বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই কাদের সিদ্দিকীই ছিলেন প্রধান নিয়ন্ত্রক।

৭০টির অধিক কোম্পানি গঠন

কাদেরিয়া বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে প্রায় ৭০টি কোম্পানি গঠন করা হয়। আবার প্রতিটি কোম্পানিকে ২/৩টি প্লাটুনে ভাগ করা হয়। সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার পদবি গ্রহণ করেন। ব্রিগেডিয়ার পদবি পান খন্দকার ফজলুর রহমান। কোম্পানি কমান্ডারসহ অন্যান্যদের কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি র‍্যাংক প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে কোম্পানি কমান্ডারগণের মধ্যে ছিলেন আবদুস সবুর খান, মনিরুল ইসলাম, রবিউল আলম গেরিলা, লোকমান হোসেন, কাজী আশরাফ হুমায়ুন বাঙ্গাল, আনিসুর রহমান, মো. আফসার উদ্দীন (ভালুকা), লাবিবুর রহমান, সারোয়ার, মো. ইদ্রিস আলী, আব্দুল গফুর, সৈয়দ গোলাম মোস্তফা, খোরশেদ আলম তালুকদার, শওকত মোমেন শাহজাহান, জয়নাল আবেদীন, হাবিবুর রহমান (ভূয়াপুর), মো. রিয়াজ উদ্দীন তালুকদার, লোকমান, আজাদ কামাল, খলিলুর রহমান, নবী নেওয়াজ, ইউনুস আলী তালুকদার, বায়েজিদ আলম, হাবিবুর রহমান, এন এ খান আজাদ, গাজী লুৎফর রহমান, আব্দুল হাকিম তালুকদার, নূরুল ইসলাম আঙ্গুর, ফেরদৌস আলম রঞ্জু, মাইন উদ্দীন আহম্মেদ, আব্দুল হাই (সরিষাবাড়ি), আব্দুল হাকিম (সরিষাবাড়ি), আলী হোসেন লাল্টু মিয়া, হাবিবুল হক খান বেনু, আব্দুর রাজ্জাক ভোলা (বর্তমানে মন্ত্রী), বকুল মিয়া, মোকাদ্দেস আলী, ফজলুল হক, খোরশেদ আলম (আর ও), তারা মিয়া, আমানউল্লাহ, এম এ খালেক, দেলবর আনসারী, কাজী জহুরুল ইসলাম চান মিয়া, আসাদুজ্জামান আরজু, আঙ্গুর তালুকদার, সাত্তার আলমগীর খান, মতিয়ার রহমান খান, ফিরোজ মিয়া, আনন্দ (ঘাটাইল), আব্দুল গফুর, খন্দকার আব্দুর রশীদ খসরু, সুলতান আহমদ (ধামরাই) মো. নিয়ত আলী, খন্দকার মুসা চৌধুরী, মোজাম্মেল হক (জামালপুর), শেখ সুজায়েত হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন, ফজলুল হক তালুকদার, রেজাউল করিম প্রমুখ। সহকারী কমান্ডার ছিলেন মো. সোলায়মান, মো. গেন্দু মিয়া, আব্দুল লতিফ, আলী হোসেন বেপারী, সাইদুর রহমান, আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী (সিরাজগঞ্জ), মো. মকবুল হোসেন, মো. আব্দুল মালেক, দেলোয়ার হোসেন (ধলাপাড়া), মো. তৈয়ব উদ্দীন, মো. আবুল হোসেন, খন্দকার শামসুল হক, খন্দকার জাহিদ মাহমুদ, শামসুল হক তালুকদার, নূরুল ইসলাম (সরিষাবাড়ি)।

প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন এম এ সামাদ, মকবুল হোসেন (মুক্তাগাছা) আব্দুল হাই শুকুর, মোজাফ্ফর হোসেন, আব্দুল হামিদ সিকদার, নাসির উদ্দীন (কুমিল্লা), আব্দুর রশিদ মিয়া, আলী আজগর তরফদার, ডা. মো. আজহার আলী, মো. মোতালেব খান গুর্খা, আব্দুস সামাদ গামা, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, হাবিব (সখীপুর) প্রমুখ। এর বাইরেও অনেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন যাদের নাম জানা সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কাদেরিয়া বাহিনীর যারা খেতাবপ্রাপ্ত হন তারা হলেন : বীর উত্তম– বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী।

বীরবিক্রম– আবদুস সবুর খান, হাবিবুর রহমান (জাহাজমারা কমান্ডার) ও আবুল কালাম আজাদ (টাঙ্গাইল শহর) এবং সখীপুরের সেনাসদস্য আব্দুর রউফ মিয়া।

বীরপ্রতীক– খোরশেদ আলম তালুকদার, হাবিবুর রহমান তালুকদার খোকা, মো. ফজলুল হক, আব্দুল গফুর মিয়া, মো. আব্দুল্লাহ, মো. আব্দুল হাকিম (সরিষাবাড়ি), সৈয়দ গোলাম মোস্তফা, আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী (সিরাজগঞ্জ), সাইদুর রহমান, মো. হামিদুল হক, ফয়েজুর রহমান ফুল, মো. খসরু মিয়া, আরিফ আহমেদ দুলাল, মো. আনিসুর রহমান ও মো. শহীদুল ইসলাম লালু। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর বাইরে মুক্তিবাহিনীর এই খেতাবপ্রাপ্তি যে কোনো মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ।

কাদেরিয়া বাহিনীর বাইরে টাঙ্গাইল জেলার খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ হলেন– শহীদ লে. খন্দকার আজিজুল ইসলাম বাবুল বীর বিক্রম, (মির্জাপুর), নৌ কমান্ডো মো. আবিদুর রহমান বীর বিক্রম (নাগরপুর), শহীদ খন্দকার রেজানুর রহমান বীর বিক্রম (নাগরপুর), শহীদ মনিরুজ্জামান খান বীর বিক্রম, শহীদ আব্দুর রকিব মিয়া বীর বিক্রম ও আব্দুস সালাম বীর বিক্রম, মনিরুল ইসলাম বীর প্রতীক (কামুটিয়া, বাসাইল) নাসির উদ্দীন বীর প্রতীক (নাগরপুর), শামছুল আলম বীর প্রতীক, নজরুল ইসলাম লেবু বীর প্রতীক, নায়েক সিরাজুল ইসলাম বীর প্রতীক, ল্যান্স নায়েক আব্দুর রহমান বীর প্রতীক, আনিছুল ইসলাম বীর প্রতীক, গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়া বীর প্রতীক (নাগরপুর)।

ফজলুর রহমান খান ফারুক
টাঙ্গাইল জেলা মুজিব বাহিনী প্রধান

বুলবুল খান মাহবুব
বিপ্লবী হাই কমান্ড প্রধান (বিলুপ্ত)

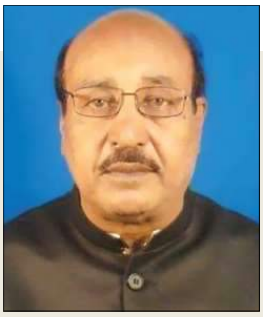

খন্দকার আবদুল বাতেন
বাতেন বাহিনী প্রধান

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে বুলবুল খান মাহবুব, সোহরাব আলী খান আরজু পশ্চিম টাঙ্গাইলে, খন্দকার আব্দুল বাতেন, মোহাম্মদ শাহজাহান প্রমুখ দক্ষিণ টাঙ্গাইলে ছাত্র-যুবকদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করেন। পরে বুলবুল খান মাহবুব ও সোহরাব আলী খান আরজু কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আনুগত্য প্রকাশ করেন। মোহাম্মদ শাহজাহান তার সহযোগীদের নিয়ে খন্দকার বাতেনের নেতৃত্বে একীভূত হন।

খন্দকার আবদুল বাতেন

নাগরপুর এলাকার খন্দকার বাতেনের বাহিনীটি 'মুজিব বাহিনী' ও 'বাতেন বাহিনী' এই দুই নামেই পরিচিতি পায়। বাতেন বাহিনী দক্ষিণ টাঙ্গাইলসহ দক্ষিণে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর, সাটুরিয়া, ঘিওর, দৌলতপুর, ঢাকার ধামরাই, পশ্চিমে যমুন নদী পার হয়ে সিরাজগঞ্জের চৌহালী পর্যন্ত যুদ্ধে ভূমিকা রাখেন। এই বাহিনীর যোদ্ধারা নৌপথে ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ করে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। বাতেন বাহিনীতে প্রায় তিন হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। কোম্পানি কমান্ডারগণের মধ্যে মেজর আব্দুস সামাদ, নায়েক সিরাজুল হক খান, নায়েক ওয়াজেদ আলী খান, নায়েক আবুল খায়ের, সুবেদার আলমগীর হোসেন, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, মো. হুমায়ুন কবীর খান, মো. ইন্তাজ আলী, মো. আব্দুর রশীদ, ফজলুল হক মল্লিক, মো. আওলাদ খান, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. আবু কায়সার ও মো. কফিল উদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। সুবেদার মেজর আব্দুল বারী ছিলেন বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার। সাটুরিয়ার তিল্লী, দেলদুয়ারের লাউহাটী ও নাগরপুরের শাহজানীর চরে স্থাপিত রিক্রুট ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেন সুবেদার মেজর আবু তাহের, সুবেদার আবুল খায়ের ও সুবেদার আলমগীর। বাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার ছিলেন খন্দকার আব্দুল করিম।

বাতেন বাহিনীতেও বেসামরিক প্রশাসন ছিল। যার দায়িত্বে ছিলেন আলী আকবর খান ডলার। সচিবের দায়িত্ব পালন করেন মহিদুর রহমান খান আলমগীর। কার্যক্রমের সুবিধার জন্য বেসামরিক প্রশাসনকে নিরাপত্তা বিভাগ, খাদ্য বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বিচার ও গণসংযোগ বিভাগ ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বিভাগে ভাগ করা হয়।

এরমধ্যে নিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ সরকার, খন্দকার আব্দুস সালাম, মীর শামসুল আলম শাহজাদা, আমিনুল ইসলাম খান, মো. শহিদুল ইসলাম, আব্দুল আলীম খান সেলিম, শহিদুল হক মল্লিক, সুলতান উদ্দীন আহমেদ, খালেদ খান যুবরাজ, মো. ইউনুস খান, মো. শামসুল আলম, মো. মেজবাহ উদ্দীন নয়ন, মো. আব্দুল গফুর খান, মো. নুরুল ইসলাম, এস এম শামসুল হুদা, মো. আজগর আলী, খন্দকার ফজলুল হক, মো. খলিলুর রহমান, আব্দুর রশীদ, মো. রোস্তম আলী, মো. মানিক, মো. শাহজাহান, মো. রেজাউল বারী খান, খন্দকার এজাজ রসুল (জানু), হাসমত আলী খান, মো. রফিকুল ইসলাম খান, আবুল হাসেম খান ঠাণ্ডা, অধ্যাপক আলী হাসান, মো. সাঈদুল ইসলাম খান, মো. শাহজাহান মাস্টার, মো. শাহজাহান, বৈষ্ণব বিশ্বাস, মো. আলী জিন্নাহ, মো. আফতাব হোসেন আরজু, খন্দকার লুৎফর রহমান মিন্টু, গৌরচন্দ্র সাহা, মো. বেনজির আহমেদ, আলমাসুদ, আব্দুল করিম খান, আমিনুর রহমান খান মজিবুর, মো. শাহজাহান খান, মো. বজলুর রহমান খান সাবু, মো. শরীফ উদ্দীন, নূপুর পোদ্দার, আনন্দ মোহন দাস, মো. জোসন আলী, ড. মো. শাহজাহান মিয়া।

খাদ্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন অরণ কুমার বোস বরুণ ও আব্দুর রাজ্জাক খান। অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন খন্দকার আব্দুস সালাম ও আব্দুর রউফ। বিচার ও গণসংযোগ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আলী আকবর খান ডলার, খন্দকার আব্দুস সালাম, মীর শামসুল আলম শাহজাদা, উপেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক আশরাফ উদ্দীন খান। বেসামরিক প্রশাসনের নিরাপত্তায় ছিলেন মো. দেলোয়ার হোসেন ও মো. সেলিম খান।

কাদেরিয়া বাহিনীর সদর দপ্তরে বঙ্গবীরের সাথে কবি রফিক আজাদ, এনায়েত করিম, আজিজ বাঙ্গাল, নজরুল ইসলাম, কবি মাহবুব সাদিক, আনোয়ার উল আলম শহীদ, কবি বুলবুল খান মাহবুব, আবদুল্লাহ বীর প্রতীক ও মেজর হাবিব বীর বিক্রম।

ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন ডা. জহিরুল ইসলাম, ডা. বসন্ত কুমার সাহা, ডা. নিখিল চন্দ্র সাহা। বাতেন বাহিনীর উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচারপত্র ছাড়াও 'অগ্নিশিখা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হতো।

মুক্তিযুদ্ধে ঘরে বসে ছিলেন না টাঙ্গাইলের নারী সমাজ। রাফেয়া আক্তার ডলি, হাজেরা সুলতানা, মোনা হোসেন, রহিমা সিদ্দিকী, খন্দকার রাবিয়া খাতুন, খন্দকার সুফিয়া চৌধুরী, খন্দকার মমতাজ চৌধুরী প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলায় ৫০০'র মতো শহীদ হন। তবে ২৪৪ জনের নাম পাওয়া গেছে। লেখকের পাশের গ্রাম রাঘলের পাড়ার ওয়াহেদ মাস্টার এপ্রিলের শুরুতে শেলের আঘাতে শহীদ হন। একই দিন কালিহাতীতে ছাত্রনেতা আজগর আলী শহীদ হন। তাদের নাম কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। এই ওয়াহেদ মাস্টারই ঘাটাইলের প্রথম শহীদ।

স্বাধীনতা অর্জনে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত, দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম আর কোটি কোটি টাকার সম্পদহানির যে খতিয়ান সেখানেও টাঙ্গাইলের অংশ ব্যাপক। স্বাধীনতার বেদিমূলে আত্মবিসর্জন দেন উপমহাদেশের মানবতাবাদী দাতা ও শিক্ষানুরাগী রণদা প্রসাদ সাহা (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) ও তার পুত্র ভবানী প্রাসাদ সাহা, কুমিল্লার জেলা প্রশাসক কে এম শামসুল হক (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত), সিরাজগঞ্জের এসডিও এ কে এম শামসুদ্দিন, কুমুদিনী মহিলা কলেজের অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হাতেম (যার নামে ১নং হাতেম কোম্পানি গঠিত হয়), নজরুল ইসলাম বাকু, ছাত্রনেতা কাজী আব্দুল হামিদ, কালিহাতীর ছাত্রনেতা আলী আজগর, ভূয়াপুরের ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুসসহ অনেক টাঙ্গাইলবাসী।

টাঙ্গাইল সেক্টরের মর্যাদা

মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলাই ছিল মূলত বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধের প্রধান নিয়ামক। কাদেরিয়া বাহিনীকে পরবর্তীতে আলাদা সেক্টরের মর্যাদা প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের অগ্রণী ভূমিকা ও অবিস্মরণীয় অবদান যুগে যুগে মুক্তিকামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে ও অনুপ্রেরণা জোগাবে।■

তথ্যসূত্র : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসের দিনগুলি, আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের 'স্বাধীনতা-৭১', আনোয়ার উল আলম শহীদের 'একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়', লেখকের 'টাঙ্গাইলের ভাষাসৈনিক', তপন কুমার দের 'মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল', আলোকিত টাঙ্গাইল-এ প্রকাশিত হায়দার রহমানের লেখা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা।

● লেখক : কবি, সাংবাদিক এবং মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর সহযোগী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য

একাত্তরে বিজয়ী হয়েছি বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল

এনায়েত করিম, সাবেক প্রশাসক
কাদেরিয়া বাহিনী, টাঙ্গাইল

মহান মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর প্রশাসক আত্মপ্রত্যয়ী ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধা আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম এর জন্ম ১৯৪০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল শহরের পারদিঘুলিয়ায় এক সম্ভ্রান্ত জোতদার পরিবারে। তাঁর পিতা মরহুম পীরে কামেল ওলিয়ে মোকাম্মেল হযরত মওলানা আলহাজ্ব আব্বাছ আলী আল ফেসানি মোজাদ্দেদী। তাঁর মা আলহাজ্ব করিমন নেছা ছিলেন ধর্মপরায়ন ও দানশীল নারী। আবু মো. এনায়েত করিম ছোটবেলা থেকেই ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত, সংস্কৃতিমনা ও সাহসী। তিনি বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও শিবনাথ হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। তিনি কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ থেকে ১৯৬৯ সালে এইচএসসি ও ১৯৭২ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
ফেরদৌস সালাম

১৯৫৭ সালে দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন এনায়েত করিম বাবা-মার অনুমতি ব্যতিরেকে ঝোঁকের বশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আরমার্ড ট্যাংক রেজিমেন্ট কোরে ইলেভেন ক্যাভালরিতে যোগদান করেন। ট্রেনিংয়ের জন্য তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের নওশেয়া নেয়া হয়। ট্রেনিং শেষে ৪ বছর চাকরির পর অনেক চেষ্টায় ১৯৬১ সালে তিনি ফিরে আসেন। চাকরির সময় তিনি পেশোয়ার, লাহোরসহ শীতপ্রধান আফতাবনগর অবস্থান করেন।

ছোটবেলা থেকেই নাটকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এনায়েত করিম। যেখানেই নাটক বা যাত্রা অনুষ্ঠিত হত সেখানেই ছুটে যেতেন। ১৯৫৬ সালে তিনি তার বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যবিতান। ১৯৫৭ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন তিনি 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হন। সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর চট্টগ্রামের রেস্টক্যাম্পেও সৈন্যদের নিয়ে 'মীর কাসিম' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

পিতার চেষ্টায় সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পুনরায় ১৯৬৭ সালে বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এসএসসি, পরে কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ থেকে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে ১৯৬৯ সালে এইচএসসি এবং ১৯৭২ সালে একই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

কলেজ জীবনের শুরু থেকেই তিনি আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর মাধ্যমে ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি কলেজ শাখার সভাপতি এবং ১৯৭০ সালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার সাথে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন আব্দুল কাদের সিদ্দিকী। ছাত্রনেতা হিসেবে এনায়েত করিম ৬৯-এর গণআন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই ঘোষণায় ব্যাপকভাবে উদ্দীপ্ত হন এবং মনে মনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

টাঙ্গাইলের প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ নাটিয়াপাড়া থেকে ফিরে পরবর্তী প্রস্তুতির লক্ষ্যে এনায়েত করিম তার শ্বশুরালয় ভূয়াপুরের চড়পাড়া ভাড়ইগ্রামে অবস্থান নেন। তিনি কাদের সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ করে এখান থেকেই বুলবুল খান মাহবুব এবং মোয়াজ্জেম হোসেন খানসহ মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি কাদেরিয়া বাহিনীর টাঙ্গাইলের পশ্চিম অঞ্চলের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পান। এ সময় বঙ্গবীরের নির্দেশে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে কমান্ডার হাবিবের নেতৃত্বে ১১ আগস্ট পাকিস্তানের অস্ত্রভর্তি জাহাজ এসটি রাজন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রচুর অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়।

পরবর্তীতে ১৭ আগস্ট কাদের সিদ্দিকীর নির্দেশে তিনি ভারতের মাইনকারচর বিএসএফ ক্যাম্পে যান। এখানে তিনি কাদের সিদ্দিকীর প্রতিনিধি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ভারত থেকে ফিরে আসার পর তিনি কাদেরিয়া বাহিনীর প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। সিএনসি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সাথে তাঁর স্বাক্ষরেই কাদেরিয়া বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বয়সের দিক থেকে প্রৌঢ় হলেও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মো. এনায়েত করিম এখনো বেশ গতিশীল মানুষ। তিনি 'আমার মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি বই লিখেছেন যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, তাঁর দুই ভাই অধ্যক্ষ শামসুল হুদা ও আব্দুল কুদ্দুস খসরুও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রত্যয়কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম যা বলেন, তা পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিশাল কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রশাসনের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জানতে চাচ্ছি আপনি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত হলেন?

এনায়েত করিম : ১৯৭০ সালে আমি টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং কাদের সিদ্দিকী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে বাঙালির স্বাধীকারের দাবিতে যে গণ আন্দোলনের সূচনা হয়, আমরা টাঙ্গাইলেও সেই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখি। ৬৯ সালের ৭ জানুয়ারি টাঙ্গাইল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে মওলানা ভাসানীও অংশ নেন এবং বিন্দুবাসিনী মাঠের বিশাল জনসমাবেশে তিনি হুংকার দিয়ে আইয়ুব খানকে হুঁশিয়ার করে বলেন, অতিসত্বর আগরতলা মামলা তুলে নিতে হবে এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দিতে হবে।

৭০ এর নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্রে স্পষ্ট ঘোষণা দেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আমি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ঘোষণা ও ভাষণ মঞ্চের অতিসন্নিকটে উপস্থিত থেকে শুনি। এ ভাষণ আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং আমাকে জীবন উৎসর্গ করে দেশ ও জাতির মুক্তি আন্দোলনের কাফেলায় দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে।

২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, কাদেরিয়া বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মঞ্চে বাঁ থেকে এনায়েত করিম, আনোয়ার উল আলম শহীদ, কাদের সিদ্দিকী ও নুরুন নবী

প্রত্যয় : টাঙ্গাইলে 'জয় বাংলা বাহিনী' গঠন ও মুক্তিযুদ্ধে এর প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি–

এনায়েত করিম : মূলত আমরা ছাত্ররা বুঝে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার ইঙ্গিত। তাই প্রতিরোধ প্রস্তুতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে টাঙ্গাইলেও গঠন করা হয় 'জয় বাংলা বাহিনী'। আমার এবং কাদের সিদ্দিকীর

নেতৃত্বে প্রায় ৪শ' তরুণ কাগমারী এম এম আলী কলেজ ও বিন্দুবাসিনী হাইস্কুলের মাঠে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কলেজের ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ চালাতাম। পরে কলেজের রোভার স্কাউট লিডার অধ্যাপক শাহ মো. আব্দুল কাদের সন্তোষ পুলিশ ফাঁড়ি থেকে একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল সংগ্রহ করে আনেন। বেশ কিছু আনসারও ট্রেনিং এ যোগ দেন।

তবে একটি বিষয় সত্য যে, ২৫ মার্চ পর্যন্ত অনেক জাতীয় নেতা ও ব্যক্তিবর্গ দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিলেন। তারা ভাবছিলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে। ভাবছিলেন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে নড়াচড়া করলে পরিস্থিতি শান্ত হবার পর ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হবে। অবস্থার পরিবর্তন হলে এই পুলিশই তখন আমাদেরকে অস্ত্র ব্যবহারের দায়ে জেলে পুরবে।

জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঘরোয়া আলাপচারিতায় বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম ও এনায়েত করিম

এসব কারণে অনেক বড় বড় নেতা তখনো ট্রেনিংয়ে আগ্রহ দেখাননি। বরং তারা 'অপেক্ষা কর এবং দেখ' এই নীতি মেনে এগুচ্ছিলেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছিলাম– সাপ মারতে যেমন লাঠি চাই, তেমনই সশস্ত্র লড়াই ছাড়া সঙ্কট সমাধানের কোনো পথ নেই।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের পর ২৬ মার্চ আদালতপাড়ায় এডভোকেট নুরুল ইসলামের বাসায় এক বৈঠকে ঢাকার নির্দেশ ছাড়া কিছু করা যাবে না বলে একজন এমপি মতামত দিলে আমি লাফিয়ে উঠে বলি–রাখেন এমপি সাহেব, ঢাকার সব মানুষরে মাইর‍্যা ফালাইছে আর আপনি নির্দেশের জন্য বইসা আছেন? তিনি কাদের সিদ্দিকীর জ্বালাময়ী বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, সবাই হঠাৎ মাতব্বর অইয়া গেছে। এই বলে তিনি সভা ত্যাগ করেন। পরে এ সভাতেই টাঙ্গাইল জেলা স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হয়।

প্রত্যয় : ৬৯-এর গণ আন্দোলন মুহূর্তে পুলিশের গুলিতে আপনার সামনেই বিশ্বনাথ সাহা মারা যান। সেই অম্লান স্মৃতিটুকু জানতে চাচ্ছি–

এনায়েত করিম : ১৯৬৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে আইয়ুব শাসনবিরোধী ছাত্রদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বেরোয়। মিছিলটি দফায় দফায় পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই সময় বুলবুল খান মাহবুব ও এসএম রেজার নেতৃত্বে একটি মিছিল টেলিফোন অফিস আক্রমণ করে কালিবাড়ি রোডে অগ্রসর হলে পুলিশের গুলিতে আদালত পাড়ার ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বিশ্বনাথ সাহাসহ বেশ ক'জন আহত হয়। বিশ্বনাথ সাহাকে আমি রক্তাক্ত অবস্থায় পাঁজাকোলা করে ডা. এইচ আর খানের চেম্বারে নিয়ে যাই, সেখানে তার মৃত্যু হয়। এতে ৫ ফেব্রুয়ারির পর টাঙ্গাইলে ছাত্র গণ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

প্রত্যয় : ২৫ মার্চ নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইলের দিকে যাত্রা শুরু করে ৩ এপ্রিল। মির্জাপুর থানার গোড়ান সাটিয়াচড়া এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। এই প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি–

এনায়েত করিম : তখনো আমরা টাঙ্গাইলে ব্যাপকভাবে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলিনি। তবে প্রস্তুতি চলছিল। ঢাকার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে টাঙ্গাইলকে রক্ষার জন্য ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গোড়ান, সাটিয়াচড়া, ধল্যা থেকে গোড়াই পর্যন্ত বহু স্থানে গাছ কেটে, মাটি কেটে এবং অন্যান্যভাবে বেরিকেড গড়ে তোলা হয়। এ সময় টাঙ্গাইল পুলিশ লাইনেও পুলিশ সদস্যগণ ও ময়মনসিংহ থেকে আসা ইপিআরদের একটি দল টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ১ এপ্রিল মহাসড়কের নাটিয়াপাড়ায় প্রথম প্রতিরোধ ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। পরদিন গোড়ান-সাটিয়াচড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেয়। ৩ এপ্রিল টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এখানে হানাদার বাহিনীর প্রথম মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। পাকুল্যা-ধল্যা পর্যন্ত সড়কের দু'পাশে বাঙ্কার কেটে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি দল নাটিয়াপাড়ায় অবস্থান নেয়। ইপিআর এর নায়েক সুবেদার আব্দুল আজিজ ও আব্দুল খালেক গোড়ান সাটিয়াচড়ার যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ভোর ৬টা থেকে প্রায় ৭/৮ ঘণ্টা যুদ্ধ হয়, এতে হানাদার বাহিনীর ৩ শতাধিক সৈন্য নিহত হয়। তাদের ভারী অস্ত্রের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সুবেদার খালেকসহ শহীদ হন ২৫/৩০ জন ইপিআর সদস্যসহ স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর ৪/৫ জন। পরে আশপাশের গ্রামে ঢুকে শতাধিক মানুষকে হত্যা করে হানাদাররা। এ অবস্থায় নাটিয়াপাড়া থেকে কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল ফিরে এসে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পাহাড় এলাকায় চলে যান।

হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় যারা সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (বর্তমানে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান) ফজলুর রহমান খান ফারুক, একাব্বর হোসেন, পুলক সরকার অন্যতম। ফজলুর রহমান খান ফারুক একটি বাঙ্কারে সুবেদার আব্দুল খালেকের পেছনে অবস্থান নেন। যুদ্ধ শুরু হলে খালেক জোর করে ফারুক সাহেবকে সরিয়ে দেন। বলেন, আপনার কোনো ট্রেনিং নেই। আপনি নেতা, আপনাদের জীবনের মূল্য অনেক। এর ১০ মিনিটের মধ্যেই সেই বাঙ্কারে খালেক হানাদারের মেশিনগানের গুলিতে শহীদ হন।

আমাদের প্রতিরোধব্যূহ ভেঙে কামানের গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দুপুরের দিকে হানাদাররা টাঙ্গাইল শহরের দিকে অগ্রসর হয়। বিষয়টি আঁচ করে ন্যাপের সৈয়দ আব্দুল মতিন এবং গোলাম আম্বিয়া নূরী বেবিট্যাক্সি নিয়ে মাইকিং করে শহরবাসীকে শহর ছেড়ে নিরাপদে যাবার জন্য মাইকিং করে। ৪ এপ্রিল হানাদার বাহিনী আদালতপাড়ার আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট নুরুল ইসলামের বাসা এবং ৫ এপ্রিল বদিউজ্জামান খান ও খন্দকার আসাদুজ্জামানের পাকা দালান ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। এমপি লতিফ সিদ্দিকীর বাড়িও পুড়িয়ে দেয় ঐদিন।

প্রত্যয় : ৩ এপ্রিলের পর আপনাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাই–

এনায়েত করিম : টাঙ্গাইল ফিরে কাদের সিদ্দিকী পুলিশের অস্ত্রাগার ভেঙে ৭০টি ৩০৩ (থ্রি নট থ্রি) রাইফেল, ২০টি একনলা/দোনলা বন্দুক, ৩০টির বেশি ডামি রাইফেল, ৩০৩ রাইফেলের ৩০/৩৫

হাজার, ৩.৯ এমএম এর ৫০০০ এর মতো গুলি নিয়ে জিপে পাহাড়ের দিকে যান। আমি পাহাড়ের দিকে না গিয়ে ভূয়াপুর থানার দক্ষিণে চড়পাড়া ভাড়ই গ্রামে আমার শ্বশুরালয়ে চলে যাই। পাহাড়িয়া এলাকায় কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হতে থাকে। ৮ মে প্রথম ২০ জন সদস্য মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি করা হয় সখীপুর স্কুল মাঠে। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাসাইল থানা আক্রমণ করা হয়। ১৭ জুন ২০/২৫ জন হানাদার সেনা অস্ত্র উদ্ধারে এলে কামুটিয়া ঘাটে যুদ্ধ হয়। ৩ জন হানাদার নিহত ও বাকিরা পালিয়ে যায়। ১৮ জুন ঘাটাইল ও ১৯ জুন গোপালপুর থানা আক্রমণ করে সকল অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর দখলে আনা হয়।

আমি ভূয়াপুরে মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করতে থাকি। আনোয়ার উল আলম শহীদ কিছুদিন আমার সাথে অবস্থান করেন। পরে আলী আজগর খান দাউদ ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান এসে যোগ দেন। পরে এ অঞ্চলে আমাকে প্রশাসকের দায়িত্ব ও বুলবুল খান মাহবুবকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

প্রত্যয় : মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনি 'আমার মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি বই লিখেছেন। সেখানে আপনি কাগমারী বেতার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬ মার্চ '৭১-এ স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা ধরা পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া সিলেট অঞ্চল থেকে মেজর রাশেদ মোশাররফ সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসারসহ ছাত্র-জনতাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আরেকটি ওয়ারলেস বার্তা প্রেরণ করেন যা টাঙ্গাইল থানার ওয়ারলেসে ধরা পড়ে বলে জানিয়েছেন। এ পর্যায়ে আপনারা কী কী পদক্ষেপ নেন?

এনায়েত করিম : ২৫ মার্চ গভীর রাতে (২৬ মার্চ) কাগমারী বেতার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা ধরা পড়ে। বার্তাটি ছিল 'আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, নির্দেশ দিচ্ছি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে সামিল হোন। শত্রুর সাথে কোনো আপোষ নেই–আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে উৎখাত করুন।' সকাল ৯টার দিকে আওয়ামী লীগ অফিসে একটা ফোন আসে কাগমারী ওয়ারলেস স্টেশন থেকে। জানানো হয়, চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছেন। ছাত্রনেতা আনোয়ার উল আলম শহীদ (যিনি পরবর্তীতে কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান) সেই ফোনটি রিসিভ করেন এবং ঘোষণাটি লিখে রাখেন এবং মাইকে তা প্রচারের উদ্যোগ নেন। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনেও শহীদ সাহেব বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনান।

প্রত্যয় : মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর কার্যক্রম নিয়মিত বাহিনীর মতোই ছিল। কিন্তু তাদের কোনো বেতন-ভাতা দেয়া হয়নি। অথচ মুজিব বাহিনীর সদস্যরা বেতন পেতেন–

এনায়েত করিম : ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী আহত হয়ে ভারতে গেলে ব্রিগেডিয়ার সানৎসিং বাবাজি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বেতনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বঙ্গবীর তাঁকে স্পষ্ট বলেছিলেন 'আমার যোদ্ধাদের বেতনের চেয়ে গুলি-বারুদ, শীতবস্ত্র, ওষুধপত্র বেশি প্রয়োজন। আপনারা এগুলো দিয়ে সহযোগিতা করলেই খুশি হবো। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফেরার সময় হাতখরচ হিসেবে প্রত্যেককে মাত্র ৬০ টাকা করে দেয়া হয়। মূলত: জনগণ নিজ উদ্যোগেই মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াতেন। আর মুক্তাঞ্চলের হাটবাজার ইজারা, নৌ পথে আদায়কৃত টোল এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান দিয়েই যোদ্ধাদের পোশাক, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য খরচাদি মেটানো হতো।

প্রত্যয় : বঙ্গবীরের নির্দেশে ও আপনার তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংসের পর ভূয়াপুরে পাকিস্তানি হানাদারদের ব্যাপক আক্রমণ মুহূর্তে আপনাদের পদক্ষেপ কী ছিল?

এনায়েত করিম : ১১ আগস্ট জাহাজ ধ্বংসের পরদিন ১২ আগস্ট খানসেনারা নৌ, স্থল এবং আকাশপথে একযোগে ভূয়াপুরে আক্রমণ শুরু করে। তাদের ৪৭তম ব্রিগেড এলেঙ্গা ও পালিমা হয়ে ভূয়াপুরে এগোতে থাকলে খোরশেদ আলম ও হুমায়ুন বাঙ্গাল তাদের বাহিনী নিয়ে গেরিলা কায়দায় হানাদারদের বাঁধাগ্রস্ত করতে থাকে। কিন্তু ভারী অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারেনি। এর মধ্যেই সন্ধ্যার পর বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ভূয়াপুরের তিন মাইল উত্তরে ফলদা বাজারে উপস্থিত হন, রাত দশটায় তিনি পাঁচটিকরি আসেন। আমরা সিএনসির সাথে দেখা করলে জাহাজ ধ্বংসের জন্য তিনি জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ১৩ আগস্ট আমরা বঙ্গবীরের নেতৃত্বে সয়া ব্রিজ এবং সিঙ্গুরিয়া পুল উড়িয়ে দেই। এতে হানাদারদের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। শত্রুপক্ষ বিমান হামলা চালাতে থাকে। আমরা মরিয়া হয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে থাকি।

বঙ্গবীর বুঝতে পারলেন যে, ভারী অস্ত্রের মুখে বেশিক্ষণ টেকা যাবে না। তিনি ভূয়াপুরের সকল কমান্ডারের কাছে জরুরি বার্তা পাঠালেন–আজ রাতেই যার যার ঘাঁটি ছেড়ে পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ের দিকে চলে যাও। সিএনসি কাদের সিদ্দিকী ভূয়াপুর বালিকা বিদ্যালয়ে রক্ষিত সমস্ত গোলাবারুদ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

ভূয়াপুর আক্রমণে হানাদার বাহিনীর নেতৃত্ব দেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজি। জানতে পারি ১৪ আগস্ট তিনি ভূয়াপুর ডাকবাংলোয় রাত কাটান। আগের দিন এখানেই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী অবস্থান করছিলেন।

প্রত্যয় : এরপর আপনারা কোথায় গেলেন?

এনায়েত করিম : বঙ্গবীরের নির্দেশ মোতাবেক আমি, মোয়াজ্জেম হোসেন খান ও পারদিঘুলিয়ার নুরুল ইসলাম ভূয়াপুরের উত্তরে ফলদা এসে

এক সময় টাঙ্গাইলের নাট্যাঙ্গনে এনায়েত করিম ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা

আশ্রয় নেই। সারাদিন পেটে কোনো দানাপানি পড়েনি। অনেক কষ্টে এক হিন্দুবাড়ি থেকে কিছু পান্তা ভাত, কাঁচা মরিচ সংগ্রহ করলেও লবণ ছিল না। লবণ ছাড়াই সেই পান্তা ভাত তৃপ্তি ভরে খাই। সন্ধ্যায় কাদের সিদ্দিকী এসে হাজির। আমাদের বললেন– হানাদাররা ভূয়াপুরে ঢুকে পড়েছে। আপনারা তাড়াতাড়ি নদীপথে ভারতে রওনা হয়ে যান। পশ্চিম দিক থেকে হানাদারদের গানবোটের শব্দ এবং আলো দেখা যাচ্ছিল। বঙ্গবীরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে যমুনা নদীর পাড়ে এলাম। কোনো নৌকা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত যমুনা নদীর কাছাকাছি গুলিপেচায় এক বাড়িতে নিরাপদে রাত কাটালাম। পরদিন একটা ছোট নৌকা ভাড়া করে পশ্চিম পাড়ে কুশাবেনু গ্রামে যাই। এখান থেকে প্রতিদিনই ৪০/৫০টি নৌকা শরণার্থী নিয়ে উত্তরে ভারতের দিকে যাচ্ছিল। এক আওয়ামী লীগ কর্মীর সহায়তায় ছইসহ ছোট নৌকা ভাড়া করে মাইনকারচরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। নৌকার সামনের দিকে কিছু পাট উঠালাম যাতে মনে হয় আমরা পাট ব্যবসায়ী। দু'জনেই গায়ের জামা ও প্যান্ট খুলে লুঙ্গি গেঞ্জি আর গামছা গলায় পেঁচিয়ে ফড়িয়া সাজলাম।

এ সময় পাকিস্তানি মিলিটারিরা পূর্বপাড়ের বাহাদুরবাদ ঘাট থেকে কামানের গোলা ছুড়ছিল। অনেক নৌকা শরণার্থীসহ গোলার আঘাতে ডুবেও যায়। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ভয়ে কালেমা পড়তে পড়তে সাহস নিয়ে চলতে থাকি। মাঝিরা বেশ দক্ষতার সাথেই মাইনকারচর পৌঁছে দেয়। সে সময় লাখো শরণার্থীর ঢল নেমেছিল মাইনকারচরে। জীবন বাঁচাতে সব কিছু ফেলে তারা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রত্যয় : ভারতে আপনার অবস্থান মুহূর্তের কোনো স্মৃতির কথা মনে পড়ে কি?

এনায়েত করিম : অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে, যা আমার বইতে উল্লেখ করেছি। ব্রিগেডিয়ার সানৎসিং ও একজন মেজর জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাদের তুরা রওশন আরা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। ক্যাম্পে ঢুকতেই শামসুর রহমান খান শাজাহান ও অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। ওনাদের ক্যাম্পেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। ব্রিগেডিয়ার সানৎসিং মাইনকারচর কামাক্ষা মন্দিরের পাশে কাদেরিয়া বাহিনীর জন্য একটি ক্যাম্প স্থাপনের ব্যবস্থা নেন। মেঘালয়ের জনসংখ্যা ছিল ১২ লাখ, আর শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৫ লাখ। আমি এবং মোয়াজ্জেম হোসেন খান নতুন ক্যাম্পের দায়িত্ব বুঝে নেই। পারদিঘুলিয়ার নুরুল ইসলামও যোগ দেন আমাদের সাথে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় খাবারের সমস্যা দেখা দেয়। আমি তাদের রেশনের ব্যবস্থা করতে তুরায় অবস্থিত জেড ফোর্সের হেডকোয়ার্টার তেলঢালা ক্যাম্পে কর্নেল জিয়াউর রহমানের সাথে দেখা করি। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ৪/৫ শ' মুক্তিযোদ্ধার জন্য ৩ দিনের চাল-ডাল-তেল-লবণ ও সাবানসহ রেশনের ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে ক্যাপ্টেন অলি ও খালেদসহ সবার সাথে পরিচয় হয়।

কর্নেল জিয়াকে একটা গাড়ির কথা বললে তিনি বলেন, দিতে পারি কিন্তু কোনো ড্রাইভার দেয়ার সুযোগ নেই। তাঁকে বলি গাড়ি ও তেল হলেই চলবে। আমি গাড়ি চালাতে জানি। গাড়ি চালিয়ে মাইনকারচরের সড়কে উঠবো, তখন দেখি একটি জিপ তুরার দিকে আসছে। জিপ থেকে নেমে আসলেন সিএনসি কাদের সিদ্দিকী। আমি লাফিয়ে নেমে তাকে স্যালুট করলাম। বঙ্গবীর বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন– কেমন আছেন, আর মিলিটারি জিপই বা কোথায় পেলেন? বললাম, সকালে কর্নেল জিয়ার সাথে দেখা করেছি। আপনার লোক শুনে যথেষ্ট সম্মান করেছেন এবং আমাদের ৩/৪ দিনের খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে আমি সীমান্তে মেজর তাহের (পরে কর্নেল তাহের)-এর নেতৃত্বে পাকিস্তানি আর্মিদের ছোড়া গুলির পাল্টা গুলি ছোড়ার একটি যুদ্ধে অংশ নিই।

প্রত্যয় : বঙ্গবীর আপনাকে ভারতে থাকতেই কাদেরিয়া বাহিনীর প্রশাসক ও ভারতে কাদেরিয়া বাহিনীর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব দেন। আপনি সে দায়িত্ব কতটা প্রতিপালন করেছেন বলে মনে করেন?

এনায়েত করিম : বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী একজন দক্ষ রণবিশারদ। তিনি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের পর তাঁর নির্দেশনাতেই আমি কয়েকবার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করি। ব্রিগেডিয়ার সানৎসিং বাবাজির সাথে যোগাযোগ করে এসব অস্ত্র সংগ্রহ করি। এসবের মধ্যে ছিল ২/৩ ইঞ্চি মর্টার, রকেট লাঞ্চার, ব্লান্ডার সাইট, গ্রেনেড থ্রোয়িং রাইফেল, এলএমজি, রাইফেল, এসএমজি, গোলাবারুদ, গ্রেনেড এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি। ট্রেনিংপ্রাপ্ত যোদ্ধারা সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে এগুলো বাংলাদেশে নিয়ে আসতো। হানাদার বাহিনীর ওপর শেষ আঘাত হানতে এগুলো বেশ কাজে লেগেছিল।

দেশে ফিরে ১৩ ডিসেম্বর সকালে টাঙ্গাইল পৌঁছেই বঙ্গবীরের নির্দেশ মোতাবেক টাঙ্গাইল ভিক্টোরিয়া রোডে রওশন সিনেমা হলের পাশে 'প্রশাসকের

অফিস' স্থাপন করি। জোনাল কাউন্সিলের নিকট ক্ষমতা প্রত্যার্পণের পূর্ব পর্যন্ত টাঙ্গাইলের সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড এই অফিস থেকেই পরিচালিত হতো। ১৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধার থাকা-খাওয়া, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজাকার-দালালদের গ্রেফতার, দুষ্কৃদের সাহায্য-সহযোগিতা সবই এই অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হতো।

প্রত্যয় : ২৪ জানুয়ারি আপনারা বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে বঙ্গবন্ধুর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করেন। সেদিনের অনুভূতির কথা বলুন–

এনায়েত করিম : যখন যুদ্ধে গিয়েছি মৃত্যুকে সাথে নিয়েই গিয়েছি। ১৬ ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হলেও আমাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার আকুতি ছিল। তিনি ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরলে মনে হলো আমরা স্বাধীনতার পরিপূর্ণ আনন্দ পাচ্ছি। তিনি যেদিন দেশের মাটিতে পা রাখেন সেদিন আমরা কেউ ঢাকা যাইনি। রাত ১১টায় স্বয়ং বঙ্গবন্ধু বঙ্গবীরকে ফোন করে জানতে চান কেন তিনি ঢাকা যাননি। পরদিন আমরা ৫টায় রওয়ানা হয়ে ৭টায় ধানমন্ডির ১৯নং রোডে পৌঁছাই। বঙ্গবন্ধু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আনোয়ার উল আলম শহীদ, নুরুন নবী, সৈয়দ নুরু, ফারুক আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, সবুর খান, মেজর হাবিব, ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমানসহ আমাদের সবার সাথেই বঙ্গবন্ধু আলিঙ্গন করেন। স্থির হয় ২৪ জানুয়ারি আমরা কাদেরিয়া বাহিনীর সব অস্ত্র বঙ্গবন্ধুর নিকট জমা দেবো।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর ২৪ জানুয়ারি শনিবার ১৯৭২ প্রথম ঢাকার বাইরে টাঙ্গাইল আসবেন অস্ত্র জমা নিতে। চারদিকে সাজ সাজ রব। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আমরা সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে টাঙ্গাইলের প্রান্তসীমা গোড়াই পৌঁছলাম। গোড়াই থেকে টাঙ্গাইল পর্যন্ত ১০/১৫ ফুট পরপর একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানানোর জন্য।

বঙ্গবন্ধুকে এসকর্ট করে টাঙ্গাইল পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে ৪০টি মোটরসাইকেল প্রস্তুত রাখা হয়। সকাল ১০টায় শতাধিক গাড়ির বহর নিয়ে বঙ্গবন্ধু গোড়াই স্বাগত তোরণের সামনে এসে থামেন। সর্বপ্রথম আমাদের বাহিনী প্রধান বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী তাকে স্বাগত জানান।

সকাল ১১টায় বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী টাঙ্গাইল ক-১৫ (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত) জিপ গাড়িটি শিবনাথ হাইস্কুল পৌঁছে। এখানে কাদেরিয়া বাহিনীর বিখ্যাত জাহাজমারা কমান্ডার মেজর হাবিবের নেতৃত্বে ১ হাজার চৌকস মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের ভূয়সী প্রশংসা করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

সকাল সাড়ে ১১টায় বঙ্গবন্ধুকে অস্ত্র জমা দেয়ার মূল অনুষ্ঠানস্থল বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। অস্ত্র জমা দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে নানা ধরনের হাজার দশেক অস্ত্র সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধু এবং বাহিনী প্রধান কাদের সিদ্দিকী মঞ্চে উঠতেই প্যারেড কমান্ডার মেজর আব্দুল হাকিম মাঠে দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধাদের সতর্ক করেন এবং সশস্ত্র অভিবাদন জানান। অভিবাদন শেষে অস্ত্র সমর্পণের প্রতীক হিসেবে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর ব্যবহৃত স্টেনগান প্রসারিত দুই হাতে সুঠামদেহ, উন্নত সীনার অধিকারী মেজর আব্দুল হাকিম সুশৃঙ্খল ও অনিন্দসুন্দর সামরিক ভঙ্গিতে মঞ্চের দিকে ত্রিশ কদম হেঁটে আমার সামনে এসে দাঁড়ান। আমি এতক্ষণ মঞ্চের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার হাতে অস্ত্রটি তুলে দিয়ে ঘুরে আগের মতোই মার্চ করে মেজর আব্দুল হাকিম তার স্থানে গিয়ে দাঁড়ান। এরপর আমি স্টেনগানটি প্রসারিত দুই হাতে মার্চ করে সামরিক কায়দায় মঞ্চে গিয়ে উঠি। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী দুই পা এগিয়ে অস্ত্রটি গ্রহণ করেন। আমি এক পা পিছিয়ে অভিবাদন জানিয়ে আবার পিছু ফিরে মার্চ করে আমার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই। দাঁড়ানোর সাথে তাল রেখে আমি ও বঙ্গবীর একসাথে বঙ্গবন্ধুর দিকে ঘুরে দাঁড়াই। এরপর দুই পা বামে সরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বহুদিনের ব্যবহৃত, বহু যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্টেনগানটি কাদেরিয়া বাহিনী প্রধান বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর পায়ের সামনে রাখেন। বঙ্গবীর হাঁটু গেড়ে বসেন। তার বসার সাথে নিখুঁত সময় ও সুন্দর তাল রেখে মাঠের পাশে প্রতীক হিসেবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো তিন হাজার মুক্তিযোদ্ধাও নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে লম্বালম্বি যার যার অস্ত্র মাটিতে রেখে আবার দাঁড়িয়ে ডানে দু'কদম সরে যায়। বঙ্গবন্ধু নিচু হয়ে দু'হাতে স্টেনগানটি তুলে অনেকক্ষণ ধরে রাখেন। বঙ্গবীর আস্তে আস্তে স্বস্থানে গিয়ে দাঁড়ান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাতের অস্ত্রটি পাশে দাঁড়ানো আনোয়ার উল আলম শহীদের হাতে তুলে দিয়ে বঙ্গবীরকে জড়িয়ে ধরেন। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর যেন পিতা-পুত্রের মিলন। দু'জনের চোখই ছিল অশ্রুসিক্ত। উপস্থিত সকলেই এই দুর্লভ দৃশ্য অবলোকন করেন।

এরপর বঙ্গবন্ধুকে মাঠে সাজিয়ে রাখা অস্ত্র পরিদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। অসংখ্য দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের মাঝ দিয়ে তিনি অস্ত্রগুলো দেখেন। আমরা কাদেরিয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে ছোটবড় মিলিয়ে এক লাখ চার হাজার অস্ত্র বঙ্গবন্ধুর নিকট জমা দেই। এসব অস্ত্র ঢাকায় নিতে ৩১৫টি ট্রাক লেগেছিল। আমার দাবি, ২৪ জানুয়ারি সরকারিভাবে মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

প্রত্যয় : আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। জীবনবাজি রেখে '৭১ সালে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। চোখে মুখে স্বপ্ন ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়িত হবে। তা হয়নি। এমনকি স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুও বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে দুঃখ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন–

এনায়েত করিম : আপনি ঠিকই বলেছেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর মূল স্বপ্ন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম

হয়েছি কিন্তু তাঁর সোনার বাংলার বাস্তবায়ন করতে পারিনি। স্বাধীনতার পর একদম ধ্বংসস্তূপ থেকে বঙ্গবন্ধু তার উন্নয়নের যাত্রা শুরু করেছিলেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী ক্ষমতালোভীরা তাকে হত্যা করে সেই উন্নয়ন যাত্রাকে স্থবির করে দেয়। মহান নেতা বঙ্গবন্ধু তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রায়সই দুঃখ করে বলতেন, যে দেশে দুই তলা থেকে নীচ তলায় আসতে আসতে ২০ টাকা কমে ১০ টাকা হয়ে যায় সেই দেশে উন্নয়ন করা কঠিন। তিনি তার অনেক ভাষণে হুঁশিয়ার করে বলেছেন– আমলা, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত মানুষই বেশি দুর্নীতি করে। আমার দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ সৎ, তারা নির্লোভ, তারা দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পেলেই সন্তুষ্ট থাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন, খেটে

বীর মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত করিম এর সাথে প্রত্যয় সম্পাদক ফেরদৌস সালাম ও নির্বাহী সম্পাদক বিদ্যুত খোশনবীশ

খাওয়া মানুষেরা দুর্নীতি করে না, দুর্নীতি করে শিক্ষিত মানুষরা। বঙ্গবন্ধু তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। দুর্নীতিবাজ, স্বাধীনতা বিরোধী ও সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ধারাকে এতোটাই বাঁধাগ্রস্ত করেছিল যে, মানুষ উন্নয়নকে বুঝতে পারেনি। এখন বঙ্গবন্ধুর কন্যা উন্নয়ন নেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে ব্যাপক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আশাবাদী, তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবেই। তবে এখনো দুর্নীতিবাজরা সোচ্চার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর মতোই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। এ ব্যাপারে দেশের মানুষকেও আন্তরিক হতে হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলতে চাই, দুর্নীতি না হলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের দেশ আরো এগিয়ে যেতো।

প্রত্যয় : মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের ১ কোটির অধিক মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। বর্তমানে মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গারা এদেশে আশ্রয় নিয়েছে–আপনার মূল্যায়ন কি?

এনায়েত করিম : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল, মায়ানমারের সেনাবাহিনীও রোহিঙ্গাদের ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মহান নেতা পেয়েছিলাম যিনি আমাদের স্বাধীনতার জন্য যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। আমরা তাই করেছি। আমাদের বাঙালি সৈনিকদের কাছে অস্ত্র ছিল, আমাদের কাছেও সংগৃহীত অস্ত্র-গ্রেনেড ছিল তা নিয়ে যেমন যুদ্ধ করেছি তেমনি এদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ তাদের যা ছিল অর্থাৎ আশ্রয়, খাদ্য, খবরাখবর দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

রোহিঙ্গারা তাদের নিজেদের দেশে থাকার জন্য যুদ্ধ বা সংগ্রাম কোনটাই করতে পারেনি। তাদের উচিত ছিল বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেয়া। আমরা ভাগ্যবান, আমাদের একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন, তাদের তা নেই। মানবতার নেত্রী শেখ হাসিনা তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু এটাই সমাধান নয়, তাদেরকে নিজ দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রত্যয় : আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, দেশে অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে–আপনার মন্তব্য কি?

এনায়েত করিম : এ ক্ষেত্রে আমাকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ভাষায় পুনরাবৃত্তি করতে হয়– কোনো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হয়নি, হয়েছে সেই শিক্ষিতরাই যাদের এক বিরাট অংশ আমলা ও রাজনীতিবিদ। এ দেশের কোটি কোটি মানুষই মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু যারা সার্টিফিকেটধারী ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমরা কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় যুদ্ধ করিনি, আর তারা এখন কিছু পাওয়ার আশায় সার্টিফিকেট বানাচ্ছে। তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে প্রকৃত তালিকা তৈরিতে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা সহায়তা দেবেন বলে আমি মনে করি।

প্রত্যয় : আপনি দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন–এই গৌরব আপনাকে কতোটা আনন্দ দেয়?

এনায়েত করিম : একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এটি আমার কাছে অবশ্যই গৌরবের এবং আনন্দের। কিন্তু নিজের প্রতি ঘৃণাও জাগে– আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে পারিনি। দেশকে স্বাধীনতা বিরোধীদের থাবা থেকে মুক্ত করতে পারিনি। দেশবাসীকে দুর্নীতি, অনিয়ম, সন্ত্রাস থেকে উদ্ধার করতে পারিনি।

প্রত্যয় : এজন্য আপনার পরামর্শ কি?

এনায়েত করিম : বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যে উন্নয়ন ধারা সৃষ্টি করেছেন সে ফসল সঠিকভাবে পাওয়ার জন্য অবশ্যই দেশ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, ঘুষসহ সকল অনাচার বন্ধ করতে হবে। এজন্য সরকারি পর্যায়ে যার যা দায়িত্ব তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিবিদদের তালিকা তৈরি করে তাদের শাস্তি দিতে হবে।

প্রত্যয় : বাংলাদেশকে নিয়ে আপনি কতোটা আশাবাদী?

এনায়েত করিম : দেখুন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই রাষ্ট্রের জনক। তাঁর সফল নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই বাংলাদেশকে নিয়ে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে দেশকে একদিন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি' বলে মন্তব্য করেছিলেন সেই দেশ আজ স্বনির্ভরতার দ্বারপ্রান্তে। একাত্তরে বিজয়ী হয়েছি বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা নিজেরা পদ্মা সেতুর মত বিশাল স্থাপনা তৈরি করছি। আমি বিশ্বাস করি, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ অবশ্যই উন্নত দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে। সেটিই হবে শহীদদের রক্তের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন।■

● আলোকচিত্র: **বিদ্যুত খোশনবীশ**

করোনা সংকটে থমকে গেছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

ড. এম. এ. ইউসুফ খান

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্রকে পুঁজি করে বেসরকারি সংস্থা এনজিও কার্যক্রমের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া সরকারি সংস্থাসমূহ যখন দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছিল না, তখনই দাতা দেশগুলোর সহযোগিতায় দেশের উদ্যমী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা এনজিওর কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশে মূলতঃ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও স্বাস্থ্যখাতে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক স্যার ফজলে হাসান আবেদ, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে এবং এভাবেই দেশের উন্নয়নে অংশীদারিত্বের একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। যাকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ এনজিও খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্ভাবনও এই এনজিও খাত থেকে। পরবর্তীতে '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর দেশে ছোট বড় অসংখ্য এনজিও গড়ে ওঠে। এই এনজিও খাত এখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রামীণ দরিদ্র জনসংখ্যার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জীবন ধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলো পুরণের সুযোগ তাদের সামর্থের বাইরে। আর এই বেসরকারি সংস্থা এনজিওগুলো ক্রমান্বয়ে তাদের বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জনগণের দোরগোড়ায় তাদের সেবাধর্মী কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি তাদের টার্গেটভূক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ বহুপথ অতিক্রম করে আজ এ পর্যায়ে এসেছে। বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্রঋণ একটি বহুল আলোচিত বিষয় যা আজ পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কাঠামোতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। বলতে গেলে বাংলাদেশই এই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূতিকাগার। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথিরিটি (এমআরএ) এ পর্যন্ত ৭৩৫টি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাকে সনদ প্রদান করেছে। শীর্ষ ১০-এ থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, টিএমএসএস, সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস (এসএসএস), জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশন, উদ্দীপন, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এবং এসডিএফ ডব্লিউ তাদের বহুমুখী ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাপকভাবে কর্মপরিধি সম্প্রসারণ করে চলেছে। তবে আশির দশকের আগে আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণের প্রধান উৎস ছিল মহাজন শ্রেণী। আর এ মহাজন শ্রেণী গলাকাটা সুদ আদায়ের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শোষণ করতো। এই সুদের হারের ব্যাপ্তি বছরে ৩৬ শতাংশ থেকে ৩৬০ শতাংশ বা তারও বেশি ছিল। অন্যদিকে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। একদিকে মহাজনের শোষণ অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের নেতিবাচক মনোভাব দেখে ক্ষুদ্রঋণের জনক অধ্যাপক ইউনূস দরিদ্র মানুষের জন্য জামানত ব্যতিরেকে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ছোট অংকের ঋণ উদ্ভাবন করেন যা এখন ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো ক্রেডিট হিসেবে পরিচিত।

গ্রামীণ মানুষের একটি বড় অংশ এখনো ব্যাংক ও আর্থিক সেবার বাইরে রয়ে গেছে। সেখানে এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর ঋণ প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ৩ কোটিরও বেশি সদস্য রয়েছে। অপরদিকে প্রায় এক কোটির বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে পরিমান বিনিয়োগ হয় তার ৭০ শতাংশের বেশি অর্থ যোগান দেয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও খাত। কিন্তু বৈশ্বিক করোনা মহামারীর আঘাতে অন্যসব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মতো থমকে গেছে এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। চলতি বছরের শুরুতে বিশ্বব্যাপী শুরু হয় করোনা সংক্রমণ। বাংলাদেশে ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি শুরু হলে ঋণের কিস্তি আদায় ও ঋণ বিতরণ এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ আদায় করেই তা পুনরায় বিতরণ করে। কিন্তু ঋণ আদায় কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞার কারণে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ঋণ আদায়েও ভাটা পড়েছে। বছরে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে এনজিও খাত। তবে করোনাভাইরাসের কারণে তিন মাসে ঋণ বিতরণ কমেছে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ৩৮ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা। এমন পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হারও স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থায়নে বড় ভূমিকা রাখছে দেশের শীর্ষস্থানীয় চারটি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা ও বুরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সুত্র থেকে জানা গেছে যে মহামারীর কারণে এই চারটি প্রতিষ্ঠানেই আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে ঋণ বিতরণ ও আদায়। করোনা পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে সামনের দিনে প্রতিষ্ঠানগুলোর মন্দ ঋণ বেড়ে যাবে। ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে স্থবিরতা থাকলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন বিঘ্নিত হবে। গ্রামের মানুষ তাদের সহায় সম্পদ বিক্রি করবে এবং এক সময় মহাজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করছি।■

● লেখক : চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি ও অর্থসচিব, বুরো বাংলাদেশ

উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশ

জামাল উদ্দীন

স্বাধীনতার পাঁচদশকে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য সংস্থাগুলো 'বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি' বলে আখ্যা দিয়েছে। ২০২০ সাল জুড়ে করোনার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা ছিল চাঙ্গা। বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে রপ্তানি ও বিনিয়োগে কিছুটা হোঁচট খেলেও বর্তমান অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী এক দশকে বাংলাদেশ হবে অনন্য অর্থনীতির দেশ। তবে সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাসহ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেছে। প্রত্যাশা করা হয়েছে, কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও আসছে নতুন বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি সামনের দিকেই এগুবে।

অক্টোবর ২০২০ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের হালনাগাদ উন্নয়ন প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। এই প্রতিবেদনে বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তা নিয়ে সতর্ক করা হলেও বাংলাদেশের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের তীব্রতা যদি কাটানো যায় এবং টিকা ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারলে অর্থনীতির সূচকগুলো এগিয়ে যাবে।

বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস-২০২০ সূচকে বাংলাদেশ ৮ ধাপ এগিয়ে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম। বিদেশি বিনিয়োগে মন্দা কাটাতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যদিও করোনা ও বিশ্বমন্দার কারণে বিনিয়োগ স্থবিরতা ছিল বিশ্বজুড়েই। করোনার কারণে কর্মসংস্থান কমেছে। কর্মী ছাঁটাই করতে হয়েছে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে। সরকারি ভাবে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে কলকারখানা চালু রাখার জন্য। যদিও সাধারণ মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ সরবরাহের দাবি ছিল। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, শুধু উৎপাদক শ্রেণীকেই প্রণোদনা দিলে হবে না, ক্রেতা-ভোক্তা শ্রেণীর হাতেও নগদ অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। নইলে

উৎপাদিত পণ্য কেনার সক্ষমতা থাকবে না ভোক্তার।

একই সঙ্গে শিল্পখাতকে চাঙ্গা করতে ব্যাংক ঋণের সুদ হার যৌক্তিককরণ জরুরি। সিঙ্গেল ডিজিট করা হলেও এখনো সার্ভিস চার্জসহ নানা কারণে সুদের হার ডাবলডিজিটই রয়ে গেছে। সরল সুদ হারও কার্যকর করা হয়নি। যদিও ইতিহাস গড়ার মতই অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছিলেন, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গণনার আগের সেই নীতি 'কম্পাউন্ড রেট' থাকবে না। কারণ, তাতে প্রকৃত সুদ হার বেড়ে যায় এবং ব্যবসা–বাণিজ্য প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু তার এই ঘোষণা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

আশার কথা যে, করোনা ভাইরাসের মহামারীর মধ্যেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিটেন্স এর ধারা অব্যাহত ছিল। ২০২০ সালের নভেম্বরে ২০৭ কোটি ৮৭ লাখ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। সব মিলিয়ে ১ জানুয়ারি থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশে এসেছে ২০৫০ কোটি ডলার (১ লাখ ৭৪ হাজার ২৫০ কোটি টাকা), যা ২০১৯ সালের পুরো সময়ের চেয়ে প্রায় ১২ শতাংশ বেশি। এর আগে এক বছরে বাংলাদেশে এত রেমিটেন্স আর কখনো আসেনি।

২০১৯ সালে ১৮৩৩ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। রেমিটেন্সের প্রবাহ চাঙ্গা থাকায় ইতিবাচক অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে রিজার্ভ ৪১ বিলিয়ন বা ৪১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে (৩ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা)। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিকে অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়াকে নির্দেশ করে। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী, একটি দেশের কাছে অন্তত তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমপরিমাণ বিদেশি মজুদ থাকলে তাকে ঝুঁকিমুক্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়। বাংলাদেশের কাছে এখন যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ আছে তা দিয়ে ৮ মাসের বেশি আমাদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। স্বাধীনতা লাভ করার পর মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল যে ছোট অর্থনীতির দেশটি, সেই দেশের বাজেট আজ পাঁচ লাখ কোটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যেকোনো সূচকের বিচারে গত দুই দশকে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে প্রশংসনীয়। জনসংখ্যা, গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার, মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার, ইত্যাদি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ সমপর্যায়ের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশ থেকে এগিয়ে রয়েছে। জিডিপির হিসাবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ক্রয়ক্ষমতার বিবেচনায় ৩৩তম। বাজেট বাস্তবায়নে পরনির্ভরতাও কমছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে দৃশ্যমান। বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতাও বাড়ছে। পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্প নিজেদের টাকায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। আকাশে উড়িয়েছে নিজস্ব স্যাটেলাইট।

সর্বোপরি, শিক্ষা ও মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) পর এবারে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের অভিষ্টে এগুচ্ছে বাংলাদেশ। সামগ্রিকভাবে দেশের এই উন্নয়ন অভিযাত্রায় ব্র্যাক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, সাজেদা ফাউন্ডেশন, টিএমএসএস, ঢাকা আহসানিয়া মিশনসহ দেশের ছোট-বড় অসংখ্য বেসরকারি সংগঠনগুলোর অবদানও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে কাজ করা এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে শিক্ষার হার বাড়াতে ব্যাপক কাজ করে চলেছে। এনজিওগুলোর নানা কর্মসূচি রয়েছে। আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, গরীব ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা সুবিধা, স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানসহ নানা কাজে এনজিওদের অবদান রয়েছে।

পল্লী কর্ম–সহায়ক ফাউণ্ডেশনের (পিকেএসএফ) সদস্য সংগঠনগুলো মাঠ পর্যায়ে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যা প্রত্যক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পিকেএসএফ 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির মাধ্যমে একটি মানবিক সমাজ গঠন ও দক্ষ তারুণ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রান্তিক পর্যায়ে এসব কর্মসূচি সুবিধাবঞ্চিতদের মূলধারায় আনতে কার্যকর হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের এই এগিয়ে যাওয়ার সুফল পাচ্ছে আপামর জনগণ। আগামী দিনে এর ব্যাপ্তি আরো বাড়বে– সেই প্রত্যাশা রইলো।■

● লেখক : সাংবাদিক, সাবেক সভাপতি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)।

আনোয়ার উল আলম শহীদ
বেঁচে থাকবেন অনাদিকাল

জাকির হোসেন

মানুষ মরণশীল কিন্তু কর্ম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে শতাব্দীর পর শতাব্দী। তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত এবং টাঙ্গাইল মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা আনোয়ার উল আলম শহীদ। যিনি তাঁর শিশুকাল থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিশু সংগঠন, স্কাউটিং, মুক্তিযুদ্ধ, দেশ-বিদেশের কর্মজীবনসহ অবসরোত্তর নানামুখী কার্যক্রমের জন্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে হয়ে থাকবেন আলোকিত।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এ জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ সত্ত্বেও অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে এক ভয়ানক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। পাক সামরিক বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালি হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। সে মুহূর্তে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি সেনা সদস্যসহ ছাত্র-জনতার অনেকেই প্রতিরোধ লড়াইয়ে অংশ নেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদ মুক্তিযুদ্ধের সেই ইতিহাসেরই এক স্বর্ণখচিত নাম। দেশমাতৃকার মুক্তি অর্জনের লড়াইয়ে যে সকল অকুতোভয় দামাল তরুণ একাত্তরে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। তিনি একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধের বিস্ময় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদ এক বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী। ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন মেধাবী এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। করতেন কচি-কাঁচার মেলা, যুক্ত ছিলেন স্কাউট আন্দোলনের সাথে। একই সাথে সচেতন ছাত্র হিসেবে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণমানুষের চেতনা ঘনিষ্ঠ ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় মিলিশিয়া ও রক্ষী বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা। সেনাবাহিনীতে ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ পদে, ছিলেন সচিব ও রাষ্ট্রদূত। অর্থাৎ তাকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অধ্যায় অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে।

একই শহরে এবং একই স্কুলের ছাত্র হবার সুবাদে এই কৃতি মানুষটির সাথে আমার পরিচয় স্কুল জীবন থেকে। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে তাকে আমি স্কাউট লিডার হিসেবে পাই। তাঁর ব্যক্তিত্ব, কথা বলার জাদুকরি প্রভাব এবং হাসিখুশি প্রাণবন্ত ব্যবহারে আমরা বরাবরই মুগ্ধ ছিলাম। স্কাউটিং এর সুবাদে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গ্রিস, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, বাহরাইন,

কুয়েত, ওমান, সিরিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণের সুযোগ পাওয়ায় আমরা সে সময় থেকেই তাঁকে নিয়ে গর্বিত ছিলাম। স্কাউট হিসেবে তার এসব বিশ্বজয়ের গল্প শুনতাম এবং আরো বেশি শ্রদ্ধাবনত হতাম। সেই কিশোর বয়সেই তার লেখা 'গ্রীস ঘুরে এলাম' পাঠক মনে বিস্ময় জাগিয়েছিল। টাঙ্গাইলের ছাত্র রাজনীতিতে যেমন বড় নেতা ছিলেন তিনি, তেমনই নিজস্ব যোগ্যতায় কেন্দ্রীয় ছাত্র রাজনীতিতেও বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর যোগ্যতা এতোটাই গ্রহণযোগ্য ছিল যে, তিনি সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের জিএস নির্বাচিত হন। ফলে ৭০ এর নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক সঙ্কট মুহূর্তে ছাত্রলীগের বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দসহ বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেন।

মূলত: একটি আলোকিত রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণের সুবাদে ছোটবেলা থেকেই আনোয়ার উল আলম শহীদ ছিলেন সৃজনশীল ও সংগঠনমনা। তিনি বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল ক্যাপ্টেন ছিলেন। সেই ছোটবেলাতেই কচিকাঁচার মেলার সাথে সম্পৃক্ত হন এবং তিনি টাঙ্গাইলের জাগরী কচিকাঁচার মেলার আয়োজকের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের আমন্ত্রণে ১৯৬২ সালে টাঙ্গাইল কচিকাঁচার মেলার অনুষ্ঠানে কবি বেগম সুফিয়া কামাল, রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই) ও ড. আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন।

১৯৬৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একুশে সংকলন 'সূর্যের গান'। তার সম্পাদনায় 'আয়না' নামের একটি পাক্ষিক সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়। প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে এ পত্রিকায় লেখা ও সম্পাদকীয় ছাপা হয়। এ নিয়ে সরকার প্রেস মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করে, তবে সরকার হেরে যায়। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইল পাবলিক লাইব্রেরির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য।

ছাত্রাবস্থায় আনোয়ার উল আলম শহীদ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী সূর্য সেন, তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীদের জীবনী পড়তেন। পড়তেন গেরিলা যুদ্ধের পথিকৃত আর্নেস্ট চে'গুয়েভারা, জেনারেল গিয়াপ, আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের নায়ক পেট্রিক লুমুম্বার নানা কাহিনী। এ ছাড়া বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা তাকে আকৃষ্ট করত। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, খান আব্দুল গাফ্ফার, শের-ই বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাহসী বক্তব্য তাকে উদীপ্ত করত। এ ধরনের আলোকিত মানুষের মহৎ জীবন অনুসরণ করে তিনি নিজেও হয়ে উঠেছেন সাহসী ও সৎ জীবনের অধিকারী যা আমৃত্যু বজায় রেখেছেন।

তিনি অনুপ্রাণিত হতেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পাক সরকারবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের কার্যক্রম দেখে। এভাবেই একজন আনোয়ার উল আলম শহীদ বৃহত্তর পরিসরে বাংলার মানুষের মুক্তি আন্দোলনের একজন অগ্রণী সৈনিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন। ১৯৬৫ সালে তারা কবি সুকান্তের জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নিলে তৎকালীন অবাঙালি মহকুমা প্রশাসক সে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন।

আনোয়ার উল আলম শহীদ ভাই ছিলেন টাঙ্গাইলের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের এক সৃজনশীল কর্মী। ষাটের দশকে তারা গড়ে তোলেন সমন্বয় সাহিত্য গোষ্ঠী। সমন্বয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর সাথে যুক্ত ছিলেন কবি সাযযাদ কাদির, কবি আল মুজাহিদী, শাজাহান সিরাজ, মাহবুব সাদিক, আসাদ তালুকদার, নূরুন নবী জর্জ, রফিকুল ইসলাম মন্টু প্রমুখ।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন তিনি চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। রাজনীতি না বুঝলেও ভাসানী-মুজিবের জনপ্রিয়তা তাকে বেশ আচ্ছন্ন করে। ১৯৬২ সালে টাঙ্গাইল শহরে মোহাম্মদ আলী মোক্তারের বাসায় গঠিত টাঙ্গাইল শহর ছাত্রলীগের প্রথম কমিটিতে তাকে কোষাধ্যক্ষ পদ দেয়া হয়। ১৯৬৩ সালে তিনি মহকুমা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক, ১৯৬৫ সালে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৯৬৮ সালে জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময়গুলোতে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী ও শেখ মুজিবসহ অনেক নেতাই কারারুদ্ধ। তাঁদের মুক্তির দাবিসহ সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

ছাত্রনেতা হিসেবে আনোয়ার উল আলম শহীদ ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনকে বেগবান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১১ দফার খসড়া তৈরির সাথেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী এসএম হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

এসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়,

একজন আনোয়ার উল আলম শহীদ ছোটবেলা থেকেই কচিকাঁচার মেলা, স্কাউটিং এবং ছাত্র রাজনীতির সোনালী অধ্যায়ের মাধ্যমে নিজেকে তিলে তিলে দক্ষ সংগঠক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের বিশাল কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান এর ভূমিকা পালনে সক্ষম হন। তিনি নিজেই বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল তার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। ছাত্রনেতা হিসেবে তার মেধা ও বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের কারণে তিনি বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন হবার সুযোগ লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই রাজনৈতিক সাংগঠনিক ভিত্তি সম্পর্কে জানতেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদের ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠাকে মূল্যায়ন করেই টাঙ্গাইলের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত

কণ্ঠে তাঁর সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদ মুক্তিযুদ্ধ শেষে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রথমে মিলিশিয়া ও পরে রক্ষীবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের পদ ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সে সময় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী কোনো এক ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি তার দায়িত্ব আনোয়ার উল আলম শহীদকে প্রদান করেন এবং শহীদ ভাই দৃঢ় মনোবল ও বুদ্ধিদীপ্তভাবেই সমস্যার সমাধান করায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটার পর রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করা হলে তাঁকে সেনাবাহিনীতে লে. কর্নেল পদে আত্মীকৃত করা হয় এবং পরে কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি পান। তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয় এবং তিনি এখানে পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই দারুসসালাম ও হংকং এ কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক হিসেবে ঢাকায় যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে বাহরাইন ও ২০০৩-২০০৭ সাল পর্যন্ত স্পেনে সচিব পদমর্যাদায় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। পেশাজীবনে আনোয়ার উল আলম শহীদ অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে সে সব দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আরো সুদৃঢ় হয়।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি পূর্বের মতোই বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হন। তরুণদের চ্যারিটেবল কার্যক্রম, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়নে প্রভূত সহায়তা প্রদান করেন। এই মানুষটি উচ্চপদে আসীন এক বিশাল বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিরহঙ্কারী, বন্ধু বৎসল ও উপকারি মনোভাবাপন্ন থেকেছেন। তিনি দীর্ঘ সময় বুরো বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিষদ ও আমৃত্যু এ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ সদস্য হিসেবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। তিনি আমাদের কার্যক্রমকে গতিশীল করার কর্মকৌশল সম্পর্কে পরামর্শসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছেন।

২০০৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তার লক্ষ্যে আমরা যখন বুরো থেকে ত্রাণ বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছিলাম, সে সময় তিনি বুরো বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত না থেকেও স্পেনের ৩টি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে বুরো বাংলাদেশ এর পক্ষে আর্থিক সাহায্য নিয়ে আসেন এবং তিনি আমাদের সাথে গিয়ে দুর্গতদের মাঝে এই ত্রাণ বিতরণ করেন। মানুষ হিসেবে তিনি যে সংবেদনশীল ও মানবিক গুণের অধিকারী এটি তার বড় উদাহরণ।

একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদ ছিলেন সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি এ দেশের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টিতে নিজ উদ্যোগে একটি মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি চেয়েছেন এ প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হোক ও তাদের মধ্যে এ সম্পর্কে ভিত্তিমূল তৈরি ও তারা নৈতিকতা সম্পন্নভাবে গড়ে উঠুক। তিনি লেখক হিসেবেও বেশ সমাদৃত। তার অনেক বই ইতোমধ্যে পাঠক হৃদয়ে স্থান লাভে সক্ষম হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীতে চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে 'রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা' গ্রন্থটি ইতিহাসের দলিল হয়ে টিকে থাকবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদরা যুগে যুগে জন্মান না। তারা এ জাতির সূর্য সন্তান। তার পেশাজীবন ছিল কলঙ্কমুক্ত, ছাত্রজীবন ছিল অধ্যয়নের এবং ৭১ এ তাঁর জীবন ছিল বিভীষিকাময় অন্ধকার থেকে জাতির মুক্তি অর্জনের দীপশিখা বিশেষ। এ কথা বাস্তব যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর মতো আদর্শবান নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তাঁর জীবনাদর্শ, মতাদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয়। এ জন্যে তাঁর সম্পর্কে লেখালেখি ও আলোচনার মাধ্যমে মানুষের কাছে তাঁর গুণাবলী তুলে ধরা প্রয়োজন। এতে তাঁর গুণাবলী অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি মনে করি।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। তিনি আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের যথেষ্ট আপনজন হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি শুধু আমাদের ঘনিষ্ঠ স্বজনই ছিলেন না, ছিলেন আমাদের অভিভাবক। আর বুরো বাংলাদেশ এর সাথে তাঁর সম্পৃক্ত হবার সুবাদে তাঁর সাংগঠনিক ও উন্নয়ন দক্ষতার বিষয়গুলো অতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর মতো অমায়িক, ভদ্র, সজ্জন মুক্তিযোদ্ধাকে হারিয়ে শুধু আমাদেরই নই জাতিরও অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথাই বলবো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল এই মানুষটি তাঁর কর্মপদচারণায় বেঁচে থাকবেন অনাদিকাল।■

● লেখক : নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ ও চেয়ারম্যান, এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি)

আনোয়ার উল আলম শহীদ : বরণীয় ব্যক্তিত্ব

এম. মোশাররফ হোসেন

বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী ও সক্রিয় যোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদের জন্ম ১৯৪৭ সালের মহররম মাসের দশ তারিখ। আশুরার শোকাবহ দিনে জন্ম বলে তাঁর ডাক নাম রাখা হয় শহীদ। জেলা শহর টাঙ্গাইলের থানা পাড়ায় এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক ভিটা কালিহাতী উপজেলার ইছাপুর।

আনোয়ার উল আলম শহীদ সেই প্রজন্মের সন্তান যাঁরা জন্মেই দেখেছেন ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি। দেশ মাতৃকার দুঃখ মোচনে নানামুখী উদ্যোগ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার মধ্যে দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন। টাঙ্গাইলের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য এই উদ্যমী তরুণ নানামুখী আগ্রহ নিয়ে জীবনের যে বিকাশ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন তার সাথে স্বদেশী সমাজের শৃঙ্খল মোচনের ছিল স্বাভাবিক সম্পর্ক। ফলে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ছাত্র-তরুণদের প্রতিবাদী চেতনা ও কর্মের সাথী হয়ে উঠেন তিনি। নিজস্ব মেধাবী নেতৃত্বের গুণে অধিকার করেন বিশেষ স্থান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে আসা একজন বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাঁধে অর্পিত হয় টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক প্রতিরোধের অনেক গুরু দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সংগঠনের বহুমাত্রিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার মধ্য দিয়ে বিশাল মুক্ত এলাকা জুড়ে চলে তাঁর প্রতিরোধের লড়াই।

গত শতকের ষাটের দশকটি বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম গৌরবের সময়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কারণ বায়ান্নর ইতিহাস কাঁপানো ভাষা রক্ষার সংগ্রামকে আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঞ্চয় বলতে পারি, তা হলে ষাটের দশককে সেই ভ্রূণ বিকাশের জন্মকাল হিসেবে সনাক্ত করা যায়। বাঙালির জীবনে ষাটের দশক একটি স্মরণীয় সময়। ঐ দশকেই বেগবান হয় জনগণের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রাম। ষাটের দশকের গণ আন্দোলনই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়েছিল, সূচনা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের। ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, তথা সামগ্রিক আন্দোলন মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি রচনা করেছিল। সেই ষাটের দশকের আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল সংগ্রামী ছাত্র সমাজ। আনোয়ার উল আলম এই প্রজন্মেরই এক গর্বিত সন্তান।

রাজনীতি মনস্ক পরিবারের সন্তান হিসেব তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন ১৯৬২ সালে। তখন থেকেই বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগের টাঙ্গাইল জেলা শাখার প্রথম কাতারের নেতা কেন্দ্রীয় সদস্য এবং ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ছাত্র-নেতা হিসেবে শহীদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম স্নেহধন্য। তাই তো স্বাধীনতার পর পরই ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ প্রথম টাঙ্গাইল সফরে এসে সাংগঠনিক ভিত্তি ও বিকাশ মূল্যায়ণ করেই

বঙ্গবন্ধু বিশাল জনসভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে মায়াবী কণ্ঠে বলেছিলেন - "আমি শহীদকে হতে দেখেছি।"

১৪ মে ১৯৭১ সালে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার বহেরাতৈল গ্রামে মুক্তিবাহিনীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর কয়েকজন প্রতিভাবান দেশভক্ত ছাত্র-তরুণদের নিয়ে তখনকার টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের অমিত সাহসী নেতা আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কাদেরিয়া বাহিনী গঠিত হলে শহীদ অনতিবিলম্বে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেন এবং দেশ মাতৃকার মুক্তি সাধনে জীবন উৎসর্গ করার শপথ নেন। এ বাহিনীতে তরুণদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়রা ছিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ, নূরুন নবী, এনায়েত করিম, মাহবুব সাদিক, শাহজাদা প্রমুখ। কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার, সহায়ক স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ছিল ৭২ হাজারেরও বেশি। ছিল সেনাবাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা। সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনার কিছু অংশ ছিল কর্মক্ষেত্র, ৫টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল সমগ্র এলাকা। এই বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধাই অধিকৃত বাংলাদেশের বাইরের কোন জায়গা থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসেননি। শাল গজারী আবৃত গভীর জঙ্গলের মধ্যে কাদেরিয়া বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। এই দপ্তরের পাঁচটি বিভাগ, যথা- (১) অস্ত্রাগার (২) বেসামরিক দপ্তর (৩) বেতার যোগাযোগ এবং টেলিফোন (৪) হাসপাতাল ও (৫) জেলখানা। যুদ্ধ জয়ের অনুপম কৌশল নির্ধারণে পারদর্শী আনোয়ার উল আলম শহীদ সদর দপ্তরের আবাসিক অধিনায়ক হলেন। তিনি ছিলেন বিশাল কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান।

সদর দপ্তরের মাধ্যমে সব কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তিনি ছিলেন কাদেরিয়া বাহিনীর সকলের কাছে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কাদের সিদ্দিকী নিজেও শহীদকে শ্রদ্ধা করতেন। শহীদ তার ছাত্র রাজনীতির অভিজ্ঞতা, অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, বিনয়, সদা বন্ধুসুলভ, সদালাপী ও নম্র ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। কাদের সিদ্দিকীর অসাধারণ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যুদ্ধ জয়ের অসম সাহসী মনোবল এবং শহীদ-এর অসাধারণ সাংগঠনিক নেতৃত্ব ছিল পরস্পরের সম্পূরক। টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের এবং বিশ্ব খ্যাতি অর্জনের মূলে এ বিষয়টি অধিক ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং বিজয় অর্জন ছিল আনোয়ার উল আলম শহীদের সমগ্র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধ ফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আনোয়ার উল আলম শহীদ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর অক্টোবরে জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আত্মীকরণ করা হয় এবং তিনি সেনাবাহিনীতে লেফটেনেন্ট কর্নেল হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে তাঁকে কর্নেল পদে পদোন্নতি দিয়ে তাঁর চাকুরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়।

আমার শ্বশুরের ছোট বোন ডা. সাঈদা খান এর জীবনসাথী আনোয়ার উল আলম শহীদ। সে হিসেবে আনোয়ার উল আলম শহীদ আমাদের ফুপা এবং ডা. সাঈদা খান ফুপি। প্রথম পরিচয় ১৯৯৭ সালে। সেই পরিচয় থেকে বিশেষ বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলাপচারিতায়।

আনোয়ার উল আলম যখন বাহরাইনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, তখন স্ব-পরিবারে আমরা সেখানে সফর করি। ২০০১ এর এপ্রিল মাসের ছয় তারিখ সকালে সে দেশের রাজধানী মানামা শহরে পৌঁছাই। বিকেলে বাংলাদেশ জালালাবাদ কমিউনিটির উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান ছিল। আমাকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালে উৎসাহ নিয়ে যোগদান করি। অনুষ্ঠানে আলোচকদের আলোচনা শুনছিলাম মঞ্চের সামনে বসে। রাষ্ট্রদূতের ইশারায় হঠাৎ ঘোষক আমার নাম ঘোষণা দিলেন আলোচক হিসেবে। স্বাধীনতা এবং জালালাবাদ অর্থাৎ সিলেট নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম এবং হল রুমে বেশ করতালি পড়ল। বক্তব্য শেষে আমাকে মঞ্চে বসিয়ে দেয়া হলো। পরদিন দেশের সকল নিউজে এটি গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হলো। তিনি আমাকে নিয়মিত স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আলোচনা ও অধ্যয়ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। বাহরাইনে আমরা স্ব-পরিবারে ১০ দিন ছিলাম। রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের লাইব্রেরিতে ডিসপ্লে করা ছিল টাঙ্গাইল মুক্তিযুদ্ধের অনেক জ্বলন্ত নিদর্শন। ছিল ১৯৭২-৭৩ সালের ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত কাদেরিয়া বাহিনী নিয়ে বিশেষ সংখ্যা– যা মুক্তিযুদ্ধের অনন্য নিদর্শন হিসেবে স্বাক্ষর বহন করে।

মানামা শহর অত্যন্ত সুন্দর, গোছানো। আমরা শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব জায়গায় গিয়েছি আনোয়ার উল আলম শহীদ এবং ডা. সাঈদা

বাহরাইনের রাজধানী মানামায় বাংলাদেশ জালালাবাদ কমিউনিটির উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আনোয়ার উল আলম শহীদসহ অন্যদের সাথে লেখক (বসা ডান থেকে ২য়)। দৈনিক গালফ পত্রিকায় প্রকাশিত।

খানের সাথে। প্রায় ৪০০ বছর ধরে বেঁচে থাকা গাছ Tree of Life হিসেবে পরিচিত যার উচ্চতা ৩২ ফিটের মত এবং মানামা শহর থেকে ৪০ কিমি. দূরে মরু উদ্যানে এই Tree of Life. এই গাছের চারিদিকে কেবল ধু-ধু মরুভূমি। মাঝখানে এই গাছ। যার সবুজ ডালপালা চারিদিকে বিস্তৃত। তবে বাহরাইনে অবস্থানকালীন আমার উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো এই মহান মুক্তিযোদ্ধার সাহচর্যে থেকে সবিস্তারে টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

আমরা যখন বাহরাইনে যাই তখন আমাদের বড় ছেলে ইয়াস এর বয়স দেড় বছর। কথা বলতে শিখছে। আমরা তখন টাঙ্গাইলে বসবাস করি। সে সুবাদে ইয়াস নানা-নানী শব্দ ভালোই বলতে পারে। ফুপা ও ফুপিও সম্পর্কে ইয়াসের নানা-নানী হয়। কিন্তু সে তার আপন নানা-নানীর সাথে মিলাতে পারছিল না। অবশেষে নিজেই তার সমাধান বের করে এবং আনোয়ার উল আলম শহীদকে বাহরাইন নান ভাই এবং তার স্ত্রী সাঈদা খানকে বাহরাইন নান বলে সম্বোধন করতে শুরু করে এবং আজ অবধি এভাবেই সম্বোধন করে।

চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তাঁরা যখন ঢাকায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন (২০০৮) তখন আমাদের ছোট ছেলে শ্রেয়াস এর বয়স আড়াই বছর। শ্রেয়াস যেহেতু ফুপা-ফুপির সাথে ঢাকায় পরিচিত হয়, সে জন্য শ্রেয়াসের কাছে তাঁরা হয়ে গেলেন ঢাকা নান ভাই এবং ঢাকা নান। আজ অবধি এই সম্ভাষণের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

আনোয়ার উল আলম শহীদ যখন স্পেনের রাষ্ট্রদূত (২০০৩-২০০৭) আমরা স্ব-পরিবারে জুলাই ২০০৪ সেখানে যাই । ২৩ জুলাই মাদ্রিদ বিমান বন্দরে পৌঁছে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বের হয়েই দেখি ফুপা (আনোয়ার উল আলম) এবং ফুপি (ডা. সাঈদা খান)। তাঁদের উপস্থিতি আমাদের বিমোহিত করে। এক সময়ের মুসলিম শাসনের স্পেনে আমাদের অবস্থান ছিল ১৫ দিন। বহু ঐতিহ্যের ধারক বাহক স্পেনকে স্ব-চক্ষে দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতা। আমাদের সাথে সার্বক্ষণিক থেকে অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন এই দুইজন গুণী মানুষ। আমাদের দেখা কিছু দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে– গ্রানাডা, আলহম্বরা (Alhambra), কর্ডোভা মসজিদ, টলাডো, এভিলা ইত্যাদি।

ইউরোপের দেশ স্পেন ফুটবল প্রেমিকদের কাছে জনপ্রিয় নাম হলেও পর্যটকদের কাছে স্পেন দেশটির আকর্ষণ হচ্ছে এর শিল্প-সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্থান ও স্থাপত্যের কারণে। বৈচিত্র্যময় শিল্প সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্থাপত্য আর অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির দেশ হিসেবে খ্যাত স্পেনের কিছু আকর্ষণীয় স্থান আমাদের ভ্রমণসূচিতে ছিল। ফুপা আগ্রহী হয়ে আমাদের এসব স্থানে নিয়ে গেলেন।

আলহাম্বরা (Alhambra) : আন্দালুসিয়ার গ্রানাডা শহরে অবস্থিত আলহাম্বরা প্রাসাদটি স্পেনের ইসলামী সংস্কৃতির এক অপরূপ শৈল্পিক নির্দশন। যা ১৪ শতকে নির্মিত হয়। স্পেনের মুসলিম নামরি রাজবংশের শাসন আমলে অত্যাশ্চর্য প্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে রয়েছে বেশ কিছু ভবন, টাওয়ার, দেয়াল, বাগান, ঝর্ণা, মসজিদ ইত্যাদি। এর সৌন্দর্য যেন স্বর্গের সৌন্দর্যকে মনে করিয়ে দেয়। প্রাসাদের বাগানসমূহ দেখে মনে হয় পৃথিবীর সকল রূপ এখানে এসে মিলিত হয়েছে।

কর্ডোভা (Cordoba) : প্রাদেশিক রাজধানী কর্ডোভা সবচেয়ে ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান। স্পেনের কর্ডোভা মসজিদটি ছিল এক সময়ে স্পেনের মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল। মুসলিম শাসনের পরাজয়ের পর এই মসজিদটি গীর্জায় রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পরে তা মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। মসজিদের ভেতরের কারুকার্য দর্শনার্থীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জিব্রাল্টার প্রণালীর মাধ্যমে সহজেই স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যে যাতায়াত সম্ভব। স্পেনের মুসলিম যুগকে প্রায়ই জ্ঞান চর্চার স্বর্ণ যুগ বলা হয়। যেখানে গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় ও হাম্মামখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর সেই সাথে বিকাশ লাভ করেছিল সাহিত্য, স্থাপত্য কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

স্পেনে ফুপার বাসায় দ্বিতীয় সফর ছিল মে মাসের ২৯ থেকে ৭ জুন, ২০০৬ সালে। বুরো বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে International

সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গতদের মাঝে বুরো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আনোয়ার উল আলম শহীদ

Association of Investors in the Social Economy (INAISE) এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি এবং নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন সেখানে গমন করি। সম্মেলনটি হয়েছিল স্পেনের সাগরের তীরে পর্যটন শহর এবং সুইজারল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী San Sebastian-এর মনোরম সম্মেলন কেন্দ্রে। যার প্রায় চারিদিকেই নীলাভ সমুদ্রের ঢেউ। সম্মেলন শেষে মাদ্রিদে আমরা ফুপির বাসার আতিথেয়তা গ্রহণ করি। একই সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকীও জেনেভায় আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্রের সম্মেলন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে রাষ্ট্রদূতের বাসায় আসেন। মাদ্রিদে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বসবাসরত মাহবুব তালুকদার (চার্টার্ড একাউটেন্ট), যিনি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে নিয়মিত কলাম লিখতেন, আমরা তিনজন এবং রাষ্ট্রদূত আনোয়ার উল আলম শহীদ একত্রে বেশ কয়েকদিন মাদ্রিদ শহরের আনাচে কানাচে ভ্রমণ করি। এ ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন মাহবুব তালুকদার, যিনি মাদ্রিদের প্রত্যেকটা স্থানের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদেরকে একজন আদর্শ গুরুর মত অবহিত করতেন এবং আমরা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শ্রবণ করে পরম আত্মতৃপ্তি লাভ করতাম। শুধু তাই নয়, মাদ্রিদ শহরের বিভিন্ন খাবার সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দিতেন এবং আমরা সকলে মিলে খাবারের স্বাদ আস্বাদন করতাম। সে সফরের একটা উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা, যা ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে এখনও অবদান রেখে চলছে, যার বর্ণনা 'সিডিএফ-এর ইতিবৃত্ত' বইতে বর্ণনা করেছি বিধায় তার পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকলাম।

নভেম্বর ২০০৭ এ ঘূর্ণিঝড় সিডর-এর তান্ডবে লন্ডভণ্ড হয়ে পড়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা। এর গতি ছিল ঘন্টায় ২৬০ কি.মি.। এতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেন এবং অসংখ্য মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং পুনর্বাসনের কাজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। সে মুহূর্তে আনোয়ার উল আলম শহীদ সবেমাত্র স্পেনের রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে দেশে এসেছেন। সিডর এর দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য কিছু করার প্রেরণা থেকে স্পেনের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য তিনি বুরো বাংলাদেশ-এর পক্ষে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ছিল Can, FLAG এবং City of Hope and Joy Foundation। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বুরো বাংলাদেশের সাথে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করেছেন Alvaro Sarmiento যিনি General Francisco Franco-এর ছেলে। General Franco ১৯৩৬ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত স্পেন শাসন করেন। শুধু ত্রাণ সংগ্রহই নয়, আনোয়ার উল আলম দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য দক্ষিণ অঞ্চলে আমাদের সাথে গমন করেন। পরবর্তীতে Alvaro-এর সাথে আমাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

আনোয়ার উল আলম শহীদ অবসর গ্রহণের পর নিজ উদ্যোগে টাঙ্গাইল মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মাধ্যমে স্কুলের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের এ জাতির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, বিশেষ করে টাঙ্গাইল মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক এবং ঘটনা বর্ণনা-আলোচনা করে তাদের দেশপ্রেমকে জাগ্রত করতেন। এভাবে কয়েক বছরে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব এবং আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এতে করে ছেলে-মেয়েদের দেশের এবং পরিবারের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। এসব ছেলে মেয়েরা নৈতিক শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হয় এবং প্রায় প্রত্যেকেই লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়েছে। তাদের অনেকেই দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। এভাবে টাঙ্গাইলে একটা জেনারেশনকে তিনি সহযোগিতা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেলো আপনজন হারানো তাদের কান্নার রোল।

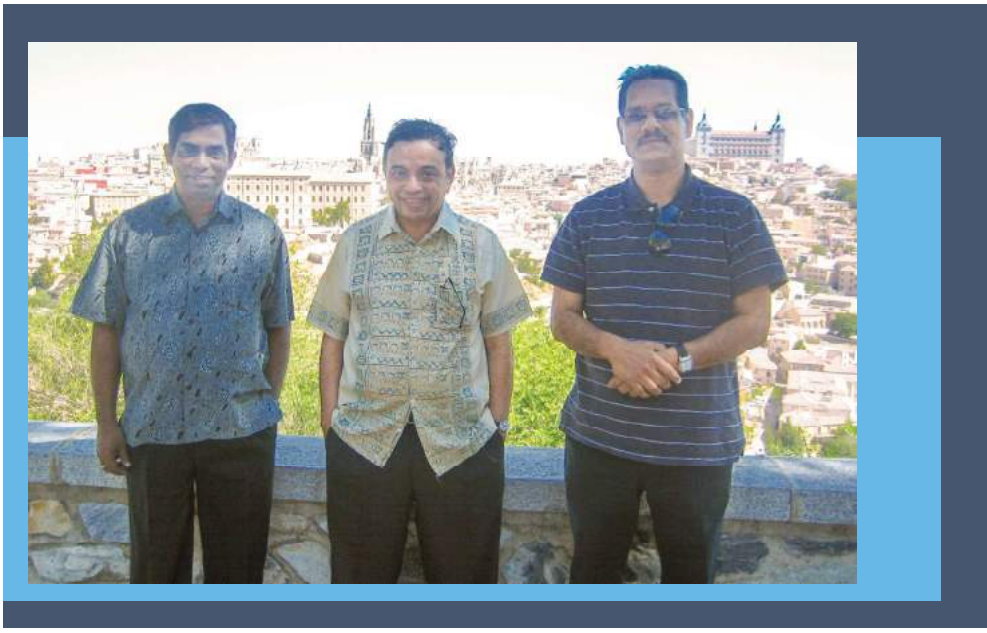

এপ্রিল ২০২০ থেকে করোনার কারণে সরকারি সাধারণ ছুটি থাকায় সার্বক্ষণিক বাসায় থাকতে হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পড়াশুনা করি। এরই অংশ হিসেবে আনোয়ার উল আলম শহীদের সাথে টেলিফোনে অনেক বিষয় নিয়ে মত বিনিময় হয়। বিশেষ করে টাঙ্গাইল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখিত অনেক বইয়ের বিভিন্ন অংশ নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। তিনি আমাকে জানান "মুক্তাঞ্চল টাঙ্গাইল" নামে একটি বই লিখছেন। কিন্তু লিখতে কষ্ট হচ্ছে কারণ চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে কোনো চক্ষু ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না। সে জন্য CMH-এর চক্ষু বিভাগের প্রধানকে চোখ দেখিয়ে আনার জন্য বললে তিনি রাজী হন এবং যথারীতি চোখ পরীক্ষা করে আসেন। চোখে বড় ধরণের সমস্যা নেই বলে ডাক্তার অভিমত দেন। তার কিছুদিন পর ফুপাকে টেলিফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। ফুপি বললেন তাঁর কথা বলতে এখন অসুবিধা হচ্ছে। অক্টোবরের প্রথম দিকে ফুপার আবার দাঁতের সমস্যা দেখা দিলো। দন্ত চিকিৎসাও ভালোমত হলো।

অক্টোবরের প্রথম দিকে আমি ফুপাকে দেখতে যাই। সে দিন বেশ সুস্থ ছিলেন এবং অনেক গল্প করলেন। বললেন, ভালোই আছেন। তবে চোখের অসুবিধার কারণে লিখতে-পড়তে পারছেন না। অক্টোবরের ২১ তারিখে ফুপাকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো হলে মূল অসুখ সম্পর্কে ফুপি জানতে পারলেন। ঐ দিন রাতে ফুপি আমাকে ফোনে তা অবহিত করেন। পরদিন শুক্রবার (২২ অক্টোবর) আমরা স্বপরিবারে দেখতে গেলাম। বিছানাতে শুয়ে ছিলেন এবং উঠা বসা কষ্টকর হলেও আমাদের দেখে অন্যের সাহায্যে উঠে বসলেন এবং সামান্য কথাবার্তা বললেন। কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ঐ দিনই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপারেশন করার জন্য সকল ধরনের চেকআপের কাজ শেষ করে অপারেশনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আনোয়ার উল আলম শহীদের মস্তিকে অপারেশন হওয়া নির্ধারিত ছিল

Tree of Life, বাহরাইন

১ নভেম্বর ২০২০। ৩১ অক্টোবর শনিবার আমি সকালে হাসাপাতালে গেলাম দেখা করতে এবং অপারেশনের প্রয়োজনীয় কিছু কাগজ স্বাক্ষর করার জন্য। বিভিন্ন বিষয়ে টুকিটাকি অনেক কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে কয়েকবার আমাকে বললেন র‍্যামোনা আসবে ১ তারিখে (১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১২টায়। অথচ র‍্যামোনার তখন দেশে আসার তারিখ ঠিক হয়নি। এক পর্যায়ে বললেন কাল খুব ভালো খেয়েছি। তানুর (আমার স্ত্রী তানিয়া) মুরগী রান্নাটা ভালো ছিল। ইতোমধ্যে দুপুর হলো এবং তিনি খাবার গ্রহণ করলেন। খাবার শেষে আমাকে বললেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তুমি যে গানটি লিখেছ তা শোনাও। গানটির প্রাথমিক সুরে পুরা গানটি শোনালাম। ভাত খেয়ে মনোযোগ সহকারে গানটি শুনলেন এবং কিছুক্ষণ কথা বলে ঘুমিয়ে গেলেন। অপারেশনের দিন (১ নভেম্বর) সকালে দেখা হলে সালাম বিনিময় হলো– তবে তেমন কথা হয়নি।

অপারেশনের সারাদিন ও রাতে তানিয়া এবং ফুপি একসাথেই হাসপাতালে ছিলেন। ৩ নভেম্বর ফুপির করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এলে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হলো। এদিকে ৫ নভেম্বর থেকে তানিয়ারও করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এলে তাকেও কোয়ারেন্টাইনে যেতে হলো। এদিকে হাসাপাতালে ICU-তে ফুপা। নিয়মিত খবর নেয়া এবং ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দুই-একজন সার্বক্ষণিক থাকা প্রয়োজন। অথচ ফুপি এবং তানিয়ার পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব। এ রকম পরিস্থিতিতে সহৃদয় চিত্তে এগিয়ে এলেন বুরো ক্রাফটের পরিচালক রাহেলা জাকির। প্রতিদিন দুই বার করে হাসপাতালে যেয়ে সকল কিছুই তাঁকে করতে হয়েছে। মাঝে কোনদিন যেতে না পারলে অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশনস) ফারমিনা বাঁধন গিয়েছেন। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি সবাই। পরবর্তীতে ১৪ নভেম্বর ফুপি করোনা মুক্ত হলে তাঁকে দুর্বল শরীর নিয়ে হাসপাতালে যাতায়াত করতে হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে ছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ বুধবার রাতে (৯ ডিসেম্বর) ফুপি এবং রাহেলা জাকির সারা রাত হাসপাতালেই ছিলেন। এ রকম সহযোগিতার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

২০১০ সাল থেকে আনোয়ার উল আলম ছিলেন বুরো বাংলাদেশ-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য এবং ২০১০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ বছর সংস্থার গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সংস্থার গতি এবং লক্ষ্য ঠিক রাখার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। সহযোগিতার সকল ক্ষেত্রেই তিনি অবদান রেখেছেন। হাসাপাতালে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও বুরো বাংলাদেশ-এর খোঁজ খবর নিয়েছেন। তাঁর অসুস্থ অবস্থায় রক্তের প্রয়োজন হলে সংস্থার কর্মীদের মধ্যে থেকে যাদের সাথে রক্তের গ্রুপে মিল ছিল তাদের রক্ত দেয়া ছাড়াও আনুষাঙ্গিক অনেক কাজে নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন হৃষ্টচিত্তে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা হাজারও ইতিহাসের সুখ-দুঃখের সাক্ষী আনোয়ার উল আলম শহীদ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ (বৃহস্পতিবার) সকালে ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অহঙ্কার। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী যখন উদযাপিত হবে তখন বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের জ্বলন্ত প্রতীক আনোয়ার উল আলম শহীদ আমাদের মাঝে থাকবেন না, এটি দেশপ্রেমিক সচেতন মানুষের কাছে সত্যিই বেদনার। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বর্ণ-গোত্র, দেশ-জাতি বা বংশভেদে কোন পার্থক্য হয় না। কার জন্ম ও মৃত্যু কোথায় এবং কখন, কিভাবে হবে ইত্যাদি স্বয়ং আল্লাহপাক নির্ধারণ করেছেন। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই, পার্থক্য শুধু সময়ের। ১১ ডিসেম্বর ছিল টাঙ্গাইল মুক্ত দিবস। তার আগের দিন জীবনাবসান হলো টাঙ্গাইলের বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদের। ১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মুক্ত দিবসে বাদ জুম্মা বনানীর সেনা গোরস্থানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চির নিদ্রায় শায়িত হন তিনি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

শা-জাহান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

● লেখক : অর্থ পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

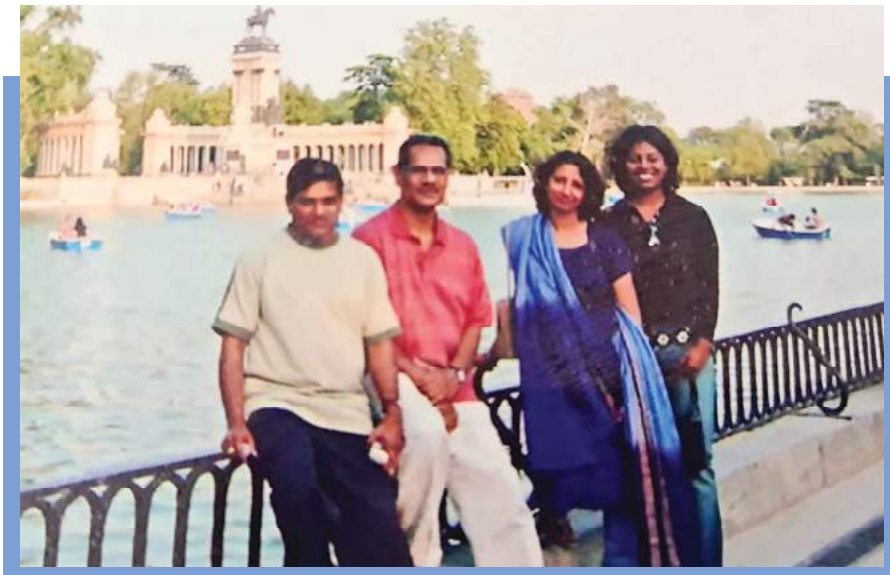

মাদ্রিদ, স্পেন

সাবেক সচিব, রাষ্ট্রদূত ও
কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান

বীর মুক্তিযোদ্ধা
আনোয়ার উল আলম শহীদ এর
জীবনালেখ্য

জন্ম : **১৯৪৭ সালে**
তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমা শহরের থানাপাড়ায়।
আশুরার দিন জন্মগ্রহণ করায় নাম রাখা হয়েছিল 'শহীদ'।

পিতা : **মৌলভী আবদুর রাহীম ইছাপুরী**
মাতা : **মোছাম্মৎ ইদন্নেছা রাহীম**

শিক্ষা জীবন

২য় শ্রেণি পর্যন্ত : বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখায়।
৩য়-৫ম শ্রেণি : টাঙ্গাইল শহরের টাউন প্রাইমারি স্কুলে।
ম্যাট্রিকুলেশন : বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৬৪।
এইচএসসি ও স্নাতক : টাঙ্গাইলের করটিয়ার সরকারি সা'দত কলেজ, ১৯৬৬ ও ১৯৬৮।
মাস্টার্স : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে, ১৯৭০।

স্কাউটিং

বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কাউটিং এর সথে যুক্ত হন এবং স্কাউট লিডার হিসেবে দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে গ্রিসের ম্যারাথনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে **'লেবার অব হারকিউলিস'** সনদ অর্জন করেন। একজন স্কাউট হিসেবে তিনি সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, ওমান, সিরিয়া ও তুরস্ক সফর করার সুযোগ পান এবং বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হন।

স্ত্রী : **ডা. সাঈদা খান,**
গাইনোকোলজিস্ট, এমবিবিএস,
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
পুত্র : **রিসাদ আনোয়ার,**
কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, যুক্তরাষ্ট্র।
কন্যা : **সারাহ র‍্যামনা আনোয়ার,**
ব্যাংকার, সুইডেন

রাজনৈতিক জীবন

১৯৬২ : ছাত্রলীগে যোগদান।
১৯৬৮ : টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।
১৯৭০ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।
১৯৭১ : টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা

- ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সেই ঘোষণা তিনি মাইকযোগে পুরো টাঙ্গাইল শহরে প্রচার করেন।
- ১৯৭১ এর মে মাসে সখীপুরের মহানন্দপুরে কাদেরিয়া বাহিনীর সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বেসামরিক প্রধান নিযুক্ত হন।
- রণদূত ছদ্মনামে টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর সাপ্তাহিক মুখপত্র রণাঙ্গনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।
- বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম সমাবেশে তিনিও বক্তৃতা করেন।
- ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি শহীদকে হতে দেখেছি'।

পেশা জীবন

- ১৯৭২: বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগদান করেন। পরে একই বছর জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠিত হলে উপপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।
- ১৯৭৫: জাতীয় রক্ষী বাহিনী বিলুপ্ত হলে লেফটেনেন্ট কর্নেল হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। পরবর্তীতে কর্নেল পদমর্যাদায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন।
- তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই দারুসসালাম ও হংকং-এ কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯৯১: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক হিসেবে ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য ডেস্কে দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯৯৪ সালে কানাডায় ডেপুটি হাই কমিশনার হিসেব যোগদান করেন।
- ১৯৯৮-২০০১ সালে বাহরাইন ও ২০০৩-২০০৭ সালে স্পেনে সচিব পদমর্যাদায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৭ সালে অবসর গ্রহণের মাধ্যমে তার কূটনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

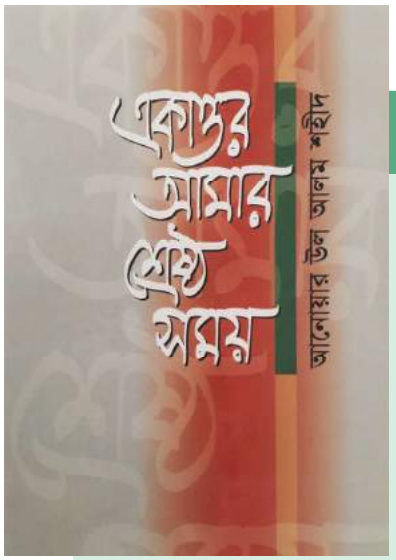

রচিত গ্রন্থ

- একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়- ২০০৯
- রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা- ২০১৪
- একাত্তরের বীর- ২০১৪
  (সাকি আনোয়ারের সাথে যৌথভাবে)
  আজীবন সংগ্রামী মৌলভী আবদুর রাহীম
- ইছাপুরী- ২০১৪
- হৃদয় অলিন্দ থেকে, ২০১৬
- গ্রিস ঘুরে এলাম- ১৯৬৪, সংবাদপত্রে প্রকাশিত (সংকলন)
- মুজিববাদ- ১৯৬৮, পুস্তিকা
- ডা. সাঈদা খান: একজন সফল মানুষের কথা সবুজ মাহমুদের সাথে যৌথভাবে (অপ্রকাশিত)
- দুর্যোগে সেনাবাহিনী (অপ্রকাশিত)
- মুক্তাঞ্চল টাঙ্গাইল (অসম্পূর্ণ)

আনোয়ার উল আলম শহীদকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ

- শহীদ: একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনচিত্র সাকী আনোয়ার, ২০০৬, ২০১৮

  জুলফিকার হায়দার ও সবুজ মাহমুদ এর সম্পাদনায়–
- চতুর্মাসিক যমুনা: আনোয়ার উল আলম সংখ্যা- ২০১৫ এবং
- ভিন্নজনের চোখে : আনোয়ার উল আলম সংখ্যা, ২০১৯

সংগঠন সম্পৃক্ততা

- তিনি সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম-এর সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।
- ছিলেন বিশ্ব পর্যটন সংস্থার স্থায়ী প্রতিনিধি, মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব মজলিশ এর সদস্য, স্পেনের জুয়ান পেরান পিকোলিয়নস ফাউন্ডেশন-এর ট্রাস্টি এবং নলেজ এন্ড একশন নেটয়ার্ক-এর ট্রাস্টি।
- বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ক্লাব, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব, রাওয়া ক্লাব, ঢাকাস্থ টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতি, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, টাঙ্গাইল ক্লাব, টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন এর সদস্য। ছিলেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ গবেষণা ফাউন্ডেশন এর সভাপতি।
- তিনি বুরো বাংলাদেশের সাধারণ পরিষদ ও গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন।
- এছাড়াও টাঙ্গাইলের নিজ বাসভবনে শহীদ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর ও কালিহাতীতে একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন তিনি। যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক ও দাতব্য কর্মকান্ডে।

মস্তিষ্কে অস্ত্রপচারের পর ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে মাসাধিক কাল চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় গত ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে আনোয়ার উল আলম শহীদ মৃত্যুবরণ করেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনী তাকে বনানী সামরিক কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করে।

আনোয়ার উল আলম শহীদ
প্রচ্ছন্ন সফলতার চিত্র

সবুজ মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধ– প্রতিটি স্বাধীনচেতা মানুষের কাছে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। পৃথিবীর বহুদেশ তাদের বীরত্বের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আমরাও দীর্ঘ ন'মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ পেয়েছি। তবে এ বিজয় ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে। যাদের অবদানে আজ আমরা বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি সেইসব বীর যোদ্ধাদের অন্যতম একজন– আনোয়ার উল আলম শহীদ। যিনি স্বদেশভূমি এবং দেশমাতৃকার দুঃখমোচনে নানা সংগ্রাম আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠেছেন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রামকে আজীবন অনুধ্যানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি জীবনমুখি শৈল্পিক আন্দোলন হওয়ায় তাঁর প্রতিটি লেখা, বক্তব্য ও কর্মের জগৎ একটি সুশৃংখল চিরায়ত শিল্প হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে। কর্মজীবনে তিনি জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপ-পরিচালক, সেনাবাহিনীর কর্নেল, সরকারি প্রশাসনের সচিব ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে একজন মুক্তিযোদ্ধা ও মননশীল লেখক পরিচয়ে তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭। এগুলো হচ্ছে:

ক. গ্রীস ঘুরে এলাম- ১৯৬৪ (ভ্রমণ কাহিনী);
খ. মুজিববাদ- ১৯৬৮ (প্রবন্ধ);
গ. একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়- ২০০৯ (আত্মজীবনী);
ঘ. রক্ষীবাহিনীর সত্যি-মিথ্যা- ২০১৪ (গবেষণা);
ঙ. একাত্তরের বীর- ২০১৪ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ);
চ. আজীবন সংগ্রামী মৌলবী আবদুর রাহীম ইছাপুরী- ২০১৪ (সম্পাদিত);
ছ. হৃদয় অলিন্দ থেকে– ২০১৬ (প্রবন্ধ);

তাঁর 'একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়' স্বাধীনতা যুদ্ধের অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত। যথেষ্ট পাঠকপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। একবার বইটির রয়্যালটির টাকা পেয়ে যারপরনাই

তিনি খুশি হন। আমাকে গর্বিতচিত্তে বলেন– 'তুমিতো লিখলে কোন সম্মানি দাও না। এই দ্যাখো আমার রয়্যালটির চেক।' কথাটি মজা করে বললেও কিছুটা বিব্রত হই। কেননা, ইতোমধ্যে যমুনা'য় তাঁর একটি লেখা ছাপা হয়েছে। পত্রিকার লেখক-কপি দিলেও কোন 'সম্মানী' দেইনি। এরকম বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম প্রখ্যাত গবেষক ও মননশীল লেখক হায়াৎ মামুদের একখানা চিঠি পেয়ে। তিনি লিখেন– 'আপনারা (প্রকাশক/সম্পাদক) মনে করেন লেখকরা বায়ুভুক। তাদের খেতে হয় না, পড়তে হয় না। যমুনা'র জন্য রুশ কবি আলেক্সান্দর ব্লক-এর তিনটি কবিতার অনুবাদ পাঠালাম। লেখকপ্রাপ্য সম্মানীটা নিম্নের ঠিকানা বরাবর পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো।'

আমি তাঁকে যথাসাধ্য সম্মানী পাঠিয়েছিলাম। এটাই যমুনা'য় কোন লেখককে দেয়া প্রথম ও শেষ 'সম্মানী'। আনোয়ার উল আলম শহীদের উপর যমুনা'র সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হয় তখন উদ্যোগী হয়ে তিনিই ঐ সংখ্যার লেখকদের দাওয়াত করে খাওয়ান। দিনব্যাপী আড্ডা চলে ইছাপুরী লজে। তিনি অন্যের প্রাপ্য 'সম্মানী'র বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝতেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত প্রকাশক ও সাহিত্য সম্পাদকগণ লেখকদের 'সম্মানী' দেয়াকে বোঝা মনে করেন। যারা সামর্থ্য রাখেন তারাও বণ্টন বৈষম্য আর স্বজনপ্রীতির কালো কাপড়ে বাঁধা। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই মফস্বলের নবাগত লেখকগণ তাদের মেধা খাটিয়ে লেখেন আর পয়সা খরচ করে প্রকাশ করেন। কিন্তু, পৃথিবীর অন্যসব দেশে 'সম্মানী' দেওয়ার রীতি আছে। এটি লেখকের অবশ্যপ্রাপ্য অধিকার। আমাদের দেশে পত্রিকার কাগজ, কালি, বাঁধাই খরচের টাকা থাকে কিন্তু 'সম্মানী'র অর্থের বড় অভাব। টাঙ্গাইলে সাপ্তাহিক 'পূর্বাকাশ' নিয়মিতভাবে সাহিত্যপাতার লেখকদের 'সম্মানী' দিয়ে থাকেন। ইদানিং বুরো বাংলাদেশের মুখপত্র 'প্রত্যয়' সম্মানী দেয়ার রীতি চালু করেছে। কথাটি শুনে লেখক হিসেবে যেমন অভিভূত হয়েছি তেমনি আবার সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিজেকে অনিচ্ছাকৃত কৃপণ মনে হয়েছে। লজ্জাবতীর পাতার মতো লজ্জায় কুঁকড়ে যাওয়াটা আমার জন্য স্বাভাবিকই বটে। কারণ, লেখকদের 'সম্মানী' দেওয়া যে কতোবড় প্রশান্তির জায়গা তা একবারের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। কখনো সামর্থবান হলে এটিকে নিয়মিত করার দৃঢ় ইচ্ছা আমার আছে। বিশুদ্ধ সাহিত্যের সমঝদার শহীদের চোখ থেকে এসব বিষয়ও এড়িয়ে যায়নি। তিনি দায়িত্বটাকে জীবনের প্রথম করণীয় বলে মনে করতেন। ১৯৭১-এ টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক প্রধানের দায়িত্ব পালনকালেও ছিলেন নিষ্ঠাবান। যা সকল মুক্তিযোদ্ধার মনে অনুকরণীয় ইতিহাস হয়ে এখনো গেঁথে আছে।

২.

রাজনৈতিক জীবনে শহীদ ১৯৬২ সালে ছাত্রলীগে যোগ দেন এবং শহর ছাত্রলীগের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে টাঙ্গাইল মহকুমা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপালনসহ ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, বাংলাভাষার মর্যাদারক্ষার আন্দোলন, শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলনসহ বাঙালি রাজবন্দিদের মুক্তি ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ করে সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন করেন এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

৭০-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৭০ সালে সাংস্কৃতিক সংগঠন নাট্য বিতানে'র সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শহীদের মেধা, সংযত আচরণ, সাহস, সততা ও জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর স্বাধীনতাযুদ্ধের আন্দোলনকে আরো গতিময়তা দিয়েছে। ফলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আপন নেতৃত্বগুণে অধিকার করেন বিশেষ স্থান। টাঙ্গাইলের ছোট ছোট মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলগুলোকে পুনর্গঠিত করার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে মধুপুর মহানন্দপুর মুক্তাঞ্চলে 'টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনী' নামে সুদৃঢ় প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। যা পরবর্তীতে 'কাদেরিয়া বাহিনী' নামে অধিক পরিচিতি লাভ করে। আনোয়ার উল আলম শহীদ শুরু থেকে এ বাহিনীর বেসামরিক প্রধান এবং কাদের সিদ্দিকী আহতাবস্থায় ভারতে গেলে মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত দুইমাস সর্বাধিনায়কের গুরুদায়িত্বও পালন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সফল সংগঠক হিসেবে যেমন মুজিবনগর সরকারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে বহুমাত্রিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তেমনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। এ কারণে টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম।

৩.

প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে জন্ম বলে শূন্যদশকেও আধুনিকতার ডিজিটাল হাওয়া আমার গায়ে লাগেনি। ছাইবিল, ঘুলিয়াদহ, নালের পাড়, একানী, লখাঁই আর ভেদরমাটির আল-বাতর ঘুরে এ গ্রাম ও গ্রাম করে বড় হচ্ছি। এসবের নারীনক্ষত্র আমার মুখস্ত। গ্রামের আটপাশ বিভিন্ন মহীয়সী বৃক্ষের নামে পরিচিত। আমতলা, বেলতলা, হিজলতলা, শিমুলতলা ইত্যাদি। যাতায়াতের বিশ্বস্ত মাধ্যম ছিল পা'। এছাড়াও ভুড়া, ডোংগা, ইঞ্জিনচালিত শ্যালোর চলাচল ছিল নিয়মিত। নামা এলাকা হওয়ায় এখনো আগিলা যানের ব্যবহার আছে। এসব অদূরপাল্লার যানে কি আর শতমাইলের শহর ছোঁয়া যায়? ফলে স্বভাবতই ঢাকার পিচঢালা পথঘাট, মেঘছোঁয়া দালান, রংবেরঙের মানুষ, কবি-সাহিত্যিক তেমন কিছুই চিনি না। স্থানীয় কবি মুজাফফর আলী তালুকদার আর কবি সংগঠক মাহমুদ কামালের সাথে অল্পবিস্তর পরিচয়। একেবারেই কাদামাটির মফস্বল থেকে আসা এক অজ্ঞাত-অপরিচিত তরুণ কবি। ঢাকায় দু'একটি দৈনিকের সাহিত্য সম্পাদকের সাথে ওঠাবসা শুরু করেছি মাত্র। যে শরীরে দাগ কাটলে জল-শ্যাওলার সফেদচিত্র ফুটে ওঠে, মুখে আহিরের গন্ধ– সবুজবন আর ঢেপ-শালুকের জীর্ণ প্রচ্ছদে মোড়ানো গ্রাম তার উপযুক্ত স্থান। এসব জানা সত্ত্বেও ঢাকার পত্রিকায় কবিতা ছাপিয়ে বিখ্যাত হওয়ার নেশায় পড়ে যাই। গায়ে বিখ্যাতের তক্‌মা লাগাতে না পারলেও অন্তত, গুণীব্যক্তিদের সাথে তো পরিচয় হতে পারবো। কিন্তু কে শুনবে আমার কথা? এখানে কেউ কাউকে জায়গা দিতে চায় না। সেই সময় ঢাকার ইট-পাথরের মধ্যে নির্বান্ধব পরিবেশে নানা হতাশা আর নিঃসঙ্গতায় মন হাঁপিয়ে উঠতো। তখন একটু আশ্রয় আর স্নেহের জন্য কী যে ব্যাকুলতা ছিল আমার! হয়তো আনোয়ার উল আলম শহীদের মধ্যে সেই আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলাম। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমার না বলা কথার আকুতি। একসময় 'চতুর্মাসিক যমুনা'র উপদেষ্টা হিসেবে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভরসাস্থল হয়ে উঠেছিলেন। এমন নির্লোভ আর পরোপকারি ব্যক্তিটির সাথে প্রথম পরিচয় চলতি শতাব্দির প্রথম দশকের মধ্যভাগে তাঁর গুলশানের বাসায়। প্রথম দেখাতেই মনে হলো তিনি খুব আড্ডাপ্রিয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে খুব সহজেই আড্ডায় প্রাণ ফেরাতেন। আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আতিউর রহমান, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, রাশেদা কে চৌধুরী, রফিক আজাদ, মাহবুব সাদিক, মহিউদ্দিন আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ, মুনতাসির মামুন, জাকির হোসেন (বুরো বাংলাদেশ), হারুন হাবিবসহ কত যে বিখ্যাত লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তার হিসেব নেই। এতসব গুণীব্যক্তিদের ভিড়ে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী সাহিত্যবান্ধব জাকির হোসেন আমার সবচেয়ে

বেশি উপদ্রব সহ্য করেছেন, এখনো নিরলসভাবে করছেন। চালচুলোহীন একজন সম্পাদকের পক্ষে একটি সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা যে কত সংগ্রামের তা সংশ্লিষ্টজনই বুঝেন। আমাদের এই দেশে তেল মাথায় তেল দেওয়ার লোক অনেক আছে। কিন্তু ক্ষমতার ডালপালাহীন নবাগতদের সহায়তায় কাউকে তেমন পাওয়া যায় না। শহীদ নবাগত প্রতিশ্রুতিশীলদের মধ্যে সুখ খুঁজে বেড়াতেন। একবার ঈদের সময় প্রায় ডজনখানেক পথশিশুদের খাবার, পোশাকআশাক আর ভ্রমণ-স্বাদ মিটিয়ে ইচ্ছেপূরণ করেছিলেন। আব্দুর রাহীম ইছাপুরী ট্রাষ্ট গঠন করে 'শহর পরিস্কার অভিযান', 'বৃদ্ধাশ্রম, 'পথশিশুদের স্কুল',

'বি.এম কলেজ', 'শহীদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' ও 'পাঠাগার' প্রতিষ্ঠাসহ অসংখ্য মানবিক সংগঠন আর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। শহীদ তার প্রতিটি কাজকে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ও দেশপ্রেমকে বুকের ভেতর লালন করে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিকতার পরিসরে নিয়ে যেতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। এই কার্পণ্যসমাজে যে কারো কাজ ভালো লাগলে তাকে উৎসাহ দিতেন। বিশেষ করে নবাগতদের প্রতি তাঁর দরদ ছিল বেশি। কোন কারণে আমি হতাশায় ভুগলে তিনি বলতেন– 'পত্রিকা চালাইতে পারনা, মিয়া বউ পাল্‌বা কেমনে?' চতুর্মাসিক যমুনা'কে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিলো। সবসময় প্রথা ভেঙে ভালো ভালো সব কাজের আইডিয়া দিতেন। এ বছরের শুরুতে যমুনা'য় প্রকাশিত ছয়টি বিশেষ সংখ্যার নির্বাচিত লেখাগুলো দিয়ে একটি সংকলন করার ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন। এসব এখন স্মৃতিতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হারানো অর্কিড।

৪.

আমাদের সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, এসব প্রাজ্ঞজনের জীবনব্যাপী অবদানে সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁরা মহীরূহরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েও সস্তা জনপ্রিয়তা বা খ্যাতিলাভের উন্মাদনায় না মেতে চিরায়ত জীবনসত্য ও জীবনতৃষ্ণার প্রেরণায় স্বদেশের জন্য সংগোপনে কাজ করেন। এ কারণে তারা সমাজে প্রচারবিমুখ। শহীদ তেমনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। কখনো ঢাকার বিলাসী সুখ তাকে টানেনি। মাসের অর্ধেকের বেশি সময় তিনি টাঙ্গাইলে থাকতেন। সারাদিন শিশুকিশোরদের সাথে আড্ডা আর পঙ্গু, অসুস্থ, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের তদারকি করাই ছিল তাঁর নৈমিত্তিক কাজ।

ছাত্রাবস্থা থেকে লেখালেখি, সাংবাদিকতা, সমাজসেবা, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতার মাধ্যমে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন। স্কাউট হিসেবে ১৯৬২ সালে পাকিস্তান দলের সদস্য হয়ে যোগ দেন গ্রীসের বিশ্ব জাম্বুরিতে। সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ১৯৬১ সালে গঠন করেন 'জাগরি কচি-কাঁচার মেলা'। ১৯৬৩ সালে মীর মোশাররফ হোসেন সম্পাদিত পাক্ষিক 'হিতকরি'র 'কিশোর প্রাঙ্গন'-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫-৬৬ এ ইন্টারন্যাশনাল পেনপল সোসাইটি টাঙ্গাইলের প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় 'বাঙালী জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন' (বাজাসান্দো) এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এছাড়া 'মুকুল', 'জাগরি', 'সূর্যের গান', 'আয়না'সহ ১৯৭১ সালে 'রণদূত' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক 'রণাঙ্গন' সম্পাদনা করেন।

এতসব শিশুকিশোর সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে ৭৩ বছর বয়সেও তাঁর মনটা ছিল প্রচ্ছন্ন সতেজ ও তরুণ। শিশুকিশোরদের সাথে সময় কাটাতে কাটাতে তিনিও শিশুরাজ্যে হারিয়ে যেতেন। সেদিনের হৈহুল্লোর, নাচ-গান, হাসির সম্মিলিত কোরাস দেয়াল ভেদ করে ছড়িয়ে যেত সীমাহীন সীমানায়। কখনো আড্ডায় কেউ না আসলে ক্ষুদেবার্তা পাঠাতেন। ২০১৯-এর কোন একদিন আমাকেও একটি বার্তা লিখেন– 'আমি এখন টাঙ্গাইলে, চলে আসো। জরুরি কথা আছে।'

আমি আসার পর তাঁর হৃদয়ের ভেতর পুষে রাখা স্বপ্নগুলো যেন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কি এক অজানা খুশিতে তাঁর চোখমুখ আলোড়িত হতে থাকে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি বলেন– 'শোন, আমাদের বিবাহোত্তর জীবনের চারদশক পেরিয়ে গেছে, অথচ তোমার ভাবিকে (ডা. সাঈদা খানকে) তেমন কিছুই দিতে পারিনি। দুঃসময়ে সে পরিবারটাকে সামলে নিয়ে আজকের পরিপাটি সংসারে রূপ দিয়েছে। 'ডা. সাঈদা খান: একজন সফল মানুষের কথা' শিরোনামে একটি জীবনীগ্রন্থ লিখবে। তার জীবনে অনেক ভালো কাজের উদাহরণ আছে। দেশের বাইরে থেকেও স্বদেশীদের জন্য নানা কার্যক্রমে সদা ব্যস্ত থাকতেন। তথ্য সব আমি দেবো। ২০২০-এ তার জন্মদিনে বইটির মোড়ক উন্মোচন হবে। তবে কথাটি গোপন রাখবে। তোমার ভাবিকেও (ডা. সাঈদা খানকে) জানাবে না।'

আমি কথামতো তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করলাম। এরমধ্যে 'যাদের আলোয় উদ্ভাসিত বাংলাদেশ', 'জোবায়দা খাতুন চৌধুরী: সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য', 'আত্মকথা: নীলিমার নিচে' গ্রন্থসহ ডা. সাঈদা খানকে নিয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক পত্রিকার প্রচ্ছদ কাহিনি ফটোকপি করে সহযোগিতা করেন। লেখাও প্রায় শেষ। কিন্তু করোনার মহামারিতে প্রকাশনার ডেট পিছিয়ে যায়। জন্মদিনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানও হলো না। ১১ ডিসেম্বর ছিল টাঙ্গাইল হানাদারমুক্ত দিবস। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আনোয়ার উল আলম শহীদ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সমাবেশ করতেন। অথচ, সেই মহামিলনের একদিন আগেই তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

'আমি শহীদকে হতে দেখেছি'– বঙ্গবন্ধুর এই কথাটি আজ খুব মনে পড়ছে। আপাদমস্তক 'হয়েছেন'ও বটে। এতো এতো সফলতার অধিকারী ক'জনের ভাগ্যেইবা জোটে? তাঁর কাছে আমি আমরা সকলেই ঋণী। প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার কাছেই দেশ এবং জাতি ঋণী।

আনোয়ার উল আলম শহীদের অসমাপ্ত স্বপ্নের বইটি হয়তো একদিন প্রকাশ পাবে, বছর ঘুরে ভাবির জন্মদিন আর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্মিলনও ঘটবে– কিন্তু এতসব কিছুর আয়োজককে আমরা আর কখনো পাবো না। কথাটি ভাবতেই ব্যবছিন্ন হৃদয়ে ক্ষরণ ঘটে যায়।■

● লেখক : সম্পাদক, চতুর্মাসিক যমুনা

কবিতা

আমি ভাবি তাদের কথা
মতিন বৈরাগী

দিকভ্রান্তির কোলাহল নিয়ে এখনকার বছরগুলোর রূপবদল ঘটছে
আর আমার রক্তে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে তার ভয়ঙ্কর
যদিও কেউ কেউ আশাহীনতার মাঝেই আশ্রয় খোঁজেন ভাঙাচুরা স্বপ্নে
কিন্তু আমি এক উদ্যত গাছের মতো হাওয়া নিই বিশ্বাসের

আর যখন কেউ দেশের বন্দনা করে আমি উৎফুল্ল হই; কানপাতি, আর
আমার ডালপালা পাতায় প্রতিদিনের রোজনামচা লিখি
আর সবাই বলে ওসব 'পাগলের ডাইরি' কাব্য থেকে বহুদূর-
আমি দেখি আগুনের মতো ঝলক আর বিলীন হয়ে যাওয়া পরিবার
গান গাই আমার নিজের সুরের কোনো এক অতীতের
কোনো এক গোধূলির
কোনো এক ম্রিয়মান বিশ্বাসের
বাড়িয়ে নিই সহিষ্ণুতা সময়ের গতির ফলায়
যাতে ভেতরের বিদ্রোহ আরো সামর্থ হয়; জ্বলতে থাকে তুষের মতো

আর আমি কথা বলি চুপিচুপি-
একটা শহরের সাথে একটা মরা নদীর সাথে কোনো এক নির্জন দ্বীপে
এবং কিছু ঘৃণার সাথে, আর অনুপ্রেরণায় যত্ন দেই বিশ্বাসের শুশ্রূষায়
আর দেখি কতো সম্রাটের
আত্মদম্ভ পলায়ন এবং দিশেহারা দৌড় ঝাঁপ
আমার চারপাশে বোমা পড়ে মিসাইল ওড়ে কামান গর্জায় জনতার নামে
তাঁদের কাঁধে নামিয়ে দেয় একটা আন্তযুদ্ধ নিজেদের স্বার্থের

আর আমি ভাবি কে আমি?
আমি আমার বিশ্বাস থেকেই ছুঁই যন্ত্রণার তুহিন
আর ভাবি তাদের কথা যারা হারিয়ে আছে অতীতে।

জয়তু ৭ই মার্চ
কাজী রোজী

৭ই মার্চের জমাট ভাষণ
বাংলাদেশের যুদ্ধ শক্তি
বাংলাদেশের চালিকা শক্তি

বাংলাদেশের ইঞ্জিন
বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির দূরবীণ।

রোদ বিকেলের নৌবহরে
কোটি জনতা নির্ভর করে
জয় বাংলার মন্ত্র পড়ে–
স্বাধীনতার সূর্য শপথ
সেই বাংলার ইঞ্জিন
শেখ মুজিবের ইতিহাস
৭ই মার্চের দারুন দলিল
সবই বাংলার দূরবীণ

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ঘৃণা মুছে যাক
নাসির আহমেদ

ভালোবাসা তুমি মানুষের কাছে চলো
নিসর্গ থাক অন্তর জুড়ে, থাকুক
কবি তুমি সেই মানুষের কথা বলো
ক্ষুধায় কাতর মানুষ অশ্রু ঢাকুক ।

নেতা হতে চাও? নেই কোন বাঁধা, তবে
প্রগতি বিমুখ মানুষের মত নয়
জাতির পিতাকে বুকে তুলে নিতে হবে
সর্বমানবে শ্রদ্ধা থাকতে হয়।

পেছনে তাকাও, সামনে এগোতে হলে
তোমার তো আছে মার্চের গৌরব,
স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্তঃস্থলে
জাগবে ছড়িয়ে প্রকৃতির সৌরভ।

ভালোবাসা হোক মুক্তচিন্তা আর
বিশ্বমানব মৈত্রীর বন্ধন,
থেমে যাক হানাহানি আর হাহাকার
থামুক জগতে লাঞ্ছনা-ক্রন্দন।

গোলাপ ফুটুক প্রকৃতির প্রাণ থেকে
ঘৃণা মুছে যাক সম্প্রীতি ভাই ডেকে।

ক্ষমাহীন সেই ক্রোধ
দিলারা হাফিজ

আনন্দ আজ গাইছে বুঝি
জয়বাংলা সুর
পদ্মা মেঘনার জলতরঙ্গে ভাটিয়ালি
বইছে সুমধুর
পাখিরা সব ফুলের নদী,বিজয়ে গায়
স্বদেশে সম্প্রীতি
জাতিস্মরে বরেন্দ্র সেই বঙ্গভূমি চন্দ্রদ্বীপে
গৌড়-স্মৃতি
একাত্তরে জয় করেছি মহান মাটির
নতুন চরা;
কেউ ভুলে না, বিজয় ফুলের চাঁদ-ভাসানো
হাসির ছড়া
বুকের ভেতর বাতাসে ওড়ে লাল-সবুজের
পতাকা রোদ
দুলক্ষ মা-বোনের বুকে জ্বলে তবু
ক্ষমাহীন সেই ক্রোধ।

অপেক্ষা
জাহাঙ্গীর ফিরোজ

অনেক দূরে উড়ে শূন্যে হারালে পাখি
মন থেকে মুছে ফেলি তাকে
ইদানীং খুব মনে পড়ে মা-কে
শূন্যে তাকাই, খেয়াতরী নাই
রহিম মাঝিকে ডাকি, তিনি রহমান
তাঁর মহিমায় অপেক্ষায় আছি
যেন অগণন তারকার দেশ থেকে
আলোকিত খেয়া ভেসে আসে

অন্ধকারে ভয়, দয়াময়
ভরসা তোমার ইচ্ছা।
বাদবাকি কলা ও কৌশল, তেজারতি
তোমাকে নিয়েই অবিরত

শুনে ভয় জাগে ভীতি
জানি,তুমি যতটা কঠিন তারচেয়ে
প্রেমময়, প্রেমের অধিক।

আমার মুক্তিযুদ্ধ

মাহমুদ কামাল

আমার একাত্তর স্বজন-হারানো
হারিয়ে পেয়েছি কত নতুন স্বজন
পেয়েছি সমগ্র রবীন্দ্রনাথ
নজরুল তো স্বশরীরেই
সেই সাথে রূপসী বাংলার কবি।
আমার একাত্তর এই রূপসী বাংলা

আমি যুদ্ধে যেতে পারিনি
৭ই মার্চের ভাষণ শুনেছি
আমি যুদ্ধ দেখেছি
মুক্তিযোদ্ধার হাতে অস্ত্র দেখেছি
নওল কিশোর আমি
পারিনি যুদ্ধে যেতে
তার মানে এই নয়
যুদ্ধের প্রতিটি দিনে হৃদয়-নদীর ঢেউ নিস্তরঙ্গ ছিল।
কিশোরের শিরায় শিরায় তখন নতুন রক্তস্রোত
নতুন পতাকা পেতে আমিও যুদ্ধে গেছি
আমিও যুদ্ধে গেছি আলোড়িত হয়েছে হৃদয়
মন ও মনন ব্যাপে এই যুদ্ধ চলছে এখনো।

ঝরা

দীপক লাহিড়ী

ঠিকানাবিহীন কেটে গেল অনেক সময়
অবসরে ক্লান্তি নামল
ভরাবাদল, জলজ মেঘ ঘুরছে ইতস্তত
আকাশজুড়ে কি যেন ইঙ্গিত করছে নিঃস্ব তর্জনী
এখন শব্দ শব্দের গায়ে জন্ম দিচ্ছে অরণ্য
মানুষের বাসভূমি ততোধিক বাসযোগ্য নয়
ছিন্নপাতারা অযথা উড়ে যাচ্ছে এধার ওধার
নিরুদ্দেশের বসন্তদিনের ডাক শোনা যায়না তেমন
নামকরণ করার আগেই হারাচ্ছে রাতের তারারা
তবে কার কাছে যাবে এই দূরত্বের সময়
দেখলে না অবিরত বৃষ্টির ফোঁটায়
কান্না ঝরে পড়ল সারাদিন...

এ গান যেখানে সত্য

সালিম হাসান

আমরা হামেশাই ঠিক ভেবে ভুল সিদ্ধান্ত ভালবাসি
আমরা বেশিরভাগ সময় ভুল মানুষকে ভালবাসি
ভুল করব না বলে দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশও ভালবাসি
বাসতে বাসতে ডুব সাঁতারে কোথায় যে কাটে প্রহর-

মিথ্যের সপক্ষে তুমুল লড়াই, সত্যের সমান্তরাল বোধগুলো
ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খুচরো করে ফেলি কেবলই

ভুল করে আর যা-ই হোক যুদ্ধে যায় না কেউ।
ছোটবেলা গুমরে মরেছে না যেতে পাওয়া যুদ্ধদিন;
দেশের জন্য যুদ্ধ মানেই বাঁ পাশে ছলকে ওঠা রক্ত
একটি পতাকার জন্য কেউ কেউ রাখে জীবন বাজি,
বড় চড়া দামে কখনো বা কেনা হয় ফেরার তিয়াস..

মাঝেমাঝে শব্দেরাও আড়ি দেয়,
আড়মোড়া ভেঙে আসে বেভুল কৈশোর

কোন এক ঝড়জলের সকালে না পাওয়ার বেদনা নিয়ে
শাদা কাফনে মুড়ে নভোচারির মত
ভেসে যেতে যেতে কে যেন গেয়েছিল ...

তারপর... অনন্ত গোধূলি লগ্নে একদিন আমিও যে...
এ গান যেখানে সত্য সেইখানে বয়ে চলে ব্রহ্মপুত্রও

কতদূর ইথাকা
রেজাউদ্দিন স্টালিন

অনেকদূর হেঁটে এসে পেছনে তাকালে
আর বাড়ি দেখা যায় না
দৃষ্টির সূর্যপথ উঠে যায় মেঘবৃক্ষে
পেছনে কার বাড়ি
চণ্ডীদাসের নাকি কাহ্নপার
জ্ঞানদাস একবার বিদ্যাপতির নিমন্ত্রণে এসে
পথ হারিয়ে বহুদিন আলাওলের অতিথি ছিলেন
আর কালিদাসের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও
যেতে পারেননি মোহাম্মাদ সগীর

সবকিছু অচেনা অপরিচিত
গাছের দেহ সবুজ পাতারা কালো
নদীর পানি হলুদ
পাখির ডানা নীল
আর পথের ধুলা লাল

এভাবে কি চেনা যায়
যারা পেছনে সব দেখতে পারে
তাদের নাকের মধ্যে অদৃশ্য সুড়ঙ্গ
কাছাকাছি কপালে একটা সাঁকো
নিচে জলঘূর্ণি
আর গলায় সবুজ চাঁদ
পেছনে ফিরে বাড়ি দেখাটা কি খুব জরুরি
জন্মের পর থেকে হাঁটছি
আর মাঝে মধ্যে চেষ্টা করছি পেছন ফিরে দেখতে
আবছা দেখা যায় গোধূলির নাকে নক্ষত্র
এখন হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর
খুব ইচ্ছে পেছনে ফিরে দেখি
কতদূর ইথাকা

দেশ
তৌহিদ আহমেদ

আমার বিষণ্ন দেশ পড়ে আছে হাজার কঙ্কাল
লাশের পাহাড়ে ভরা আমাদের মৃত ইতিহাস
সহস্র বছর ধরে পলাশীর রক্তে ভেজা ঘাস
প্রাচীন মন্দির থেকে সপ্তদশী কালের রাখাল

তেরশ নদীর দেশ অশ্রু ভেজা মৃত মোহনায়
সমুদ্র এসেছে কাছে অবরুদ্ধ নগরীর দূত
বিদেশী বণিক আসে মিত্রভাবে অজ্ঞতা প্রসূত
হাজার পায়ের শব্দ ধুলিপায়ে নক্ষত্রে হারায়

সুপুরি গাছের সারি নাড়িপোঁতা শেকড়ের ঘ্রাণ
মাটির উনুনে পোড়ে স্বরসতী মায়ের সোহাগ
অভয়া মায়ের কোল কুরুক্ষেত্র করে দিলো ভাগ
পুরনো দিনের গল্প লক্ষীছাড়া কেঁদে উঠে প্রাণ

পুবের পাহাড় হতে লক্ষ কোটি বুনো বাইসন
বিপাশা নদীর জলে ভেসে আসে খনিজ লবন
আগুন লেগেছে বনে পোড়ে মাটি সুগন্ধি চন্দন
গভীর কন্টক ঘেরা মানচিত্র নিষিদ্ধ ভ্রমণ

নিভৃত নিশুতি রাতে সোমপুর লুপ্ত বটেশ্বর
পানাম নগর ঘুমে লালমাই মহাস্থানগড়।

অসুখ
সৈয়দ রানা মুস্তফী

অনেকদিন হলো বেশ কঠিন অসুখ করেছে পৃথিবীর
হাত পায়ে বল নেই এমন দুর্বলতা আর কখনো ঘটেনি
স্বাদ গন্ধ কিছু নেই খাবারে অরুচি খুব প্রবল হয়েছে
তাপে জ্বলে পোড়াদেহ দিন বুঝি হয়ে এলো প্রিয় ধরিত্রীর

প্যারিসের সঁজে-লিজেঁ এভিন্যুতে চুম্বনের ঢেউ থেমে গেছে
টাইমস স্কয়ারে জীবনের বদলে ক্লান্তি এসে শুয়ে থাকে প্রায়ই
লন্ডনের গমগমে পাবগুলো ভুতুড়ে বাড়ির মত পরিত্যক্ত যেন
মুম্বাই স্টুডিওগুলো অলস কাটায় দিন বরফের শীতল শহর

মাঝে এক দীর্ঘ ঘুমে চলে গেছে কয়েক শ' দিন জগতের
লাখ লাখ শবদেহ দেখে দেখে চোখ ধরে এসেছিল তার
কোটি কোটি সকরুণ আর্তনাদে ছিঁড়ে গেছে নিদ্রার আরাম
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তবু চলার চেষ্টা দেখো করছে এ জীর্ণ গ্রহটি

ওষুধ কোথায় পাবে, নিরাময় পাওয়া যাবে কিসের বদলে
কোথায় লুকোনো আছে জীবন বাঁচানো সেই ধন্বন্তরি আশা
দুনিয়া দাপিয়ে ঘোরে ছোটাছুটি করে সব বাচালের দল
রূপ রস গন্ধ আর জীবন থামিয়ে দেয় অন্ধ এক বংশীবাদক

প্রাণের ভোমরা বড় অসহায় আজ তার ডানা দু'টি অসুখে ধরেছে
কোথায় সে সাতমহল যার সিন্দুকের বোতলে ভরা পৃথিবীর প্রাণ?

তারামন বিবি
মারুফ রায়হান

মাটিতেও জন্ম নেয় তারা, চিরদ্যুতিমান
জানিয়ে দিয়েছিলো ঊনিশ শো একাত্তর
সে এক সময় গেছে দেশমাতৃকার
শুভ্র গন্ধরাজ রক্তস্নানে হয়ে উঠেছিলো
আশ্চর্য রক্তিম
আর গোলাপেরা ঢেকে গিয়েছিলো
ধবধবে কাফন-শাদায়
সেসময় ফুটেছিলো তারামন,
বাংলার আঁখিতারা
বঙ্গকিশোরী ওই হেঁশেলের খুনতি ফেলে
হাতে তুলে নিয়েছিলো স্টেনগান
তা না হলে বাংলা মা কিভাবে মুক্ত হতো!
কুড়িগ্রামে পাপড়ি মেলতো বিজয়ের পুষ্পকুঁড়ি?
ব্রহ্মপুত্রের জলে জ্বলজ্বল করতো স্বাধীনতার সূর্য!

তোমাকে অভিবাদন, হে বীরপ্রতীক
তোমাকে অন্তিম অভিবাদন,
বাংলার আঁখিতারা তারামন

নৌকা
আবদুর রব

দড়ি ছিঁড়ে প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া নৌকার
সেই ছোট্ট ছেলেটার কথা মনে পড়ে।
জোয়ারের পানি নেমে যাওয়ায়
নৌকার অর্ধেকটা শূন্যে ভাসছিল।
বুঝতে পারেনি শূন্যে ভাসা অংশে এসে দাঁড়ালে
সন্ধ্যার অন্ধকারে ভেসে যাবে সে–
খরস্রোতা নদীতে।
দেহভার আর শৈশব এভাবেই তাকে
তাড়িয়ে বেড়ায়।

হিমালয় দেখি নাই শেখ মুজিবকে দেখেছি
জাহিদ মুস্তাফা

আমি হিমালয় দেখি নাই শেখ মুজিবকে দেখেছি
গণমানুষের ভালোবাসা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ডেকেছি।
উত্তাল মার্চের জনসমুদ্রে দেখেছি তুমুল ঝড়
সে ঝড়ে মুজিব বজ্রকণ্ঠ মুক্তির জাদুকর
আগ্নেয়গিরি দেখি নাই আমি অগ্নিপুরুষ দেখেছি।

আমি দেখেছি নেতার দৃপ্ত চোখে আগুনের ফুলকি
বাঙালি মননে গেঁথে দিয়েছেন মুক্তির উলকি!
তাঁর নির্দেশে লড়াই করে দেশকে মুক্ত করেছি।
গরীবের তিনি আশা-ভরসা মেহনতিদের মিতা
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনিই জাতির পিতা।

বাংলার আকাশে মাটিতে বাতাসে তোমার কণ্ঠ শুনি
তুমি বাংলা আবহমান, এই বাংলার জয়ধ্বনি।

তারা বিজয় এনেছে
খুরশীদ আলম সাগর

মনে পড়ে তুমুল ঝড়ে দেশটা যখন কাঁপছিলো
নদীর স্রোতে বিলের জলে লাশগুলো সব ভাসছিলো
ঝড়ের গতি থামিয়ে দিতে যুবক-যুবা আসছিলো
কোরাস সুরে কেউবা তখন ব্যাঙ্গ-হাসি হাসছিলো।

কেউবা বলে নেংটি ইঁদুর বাঘের গলা চুলকালে
বাঁচবে কি সে সখের বশে আচমকা সব ফসকালে
তবুও যুবক যায় না ফিরে কী হবে কে ধমকালে
বুকের ভেতর রক্ত পলাশ দ্রোহের আগুন উসকালে।

সেই আগুনে ঝলসিয়ে নেয় পলাশ-মনের দোর
যুবক-যুবার শিমুল হাসি সিংহ মারার জোর
ছুটে চলা তীব্রগতি ভালোবাসা দেশের প্রতি
কেউ দেখেনি আগে এমন সূর্যোদয়ের জ্যোতি
সেই সাহসে শত্রু চোখে অমানিশা ঘোর
মুক্তিসেনা ছিনিয়ে আনে গর্ব-বিজয় ভোর।

পিতা ও ছায়াপথ
শাকিল রিয়াজ

বারো বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে
আমাদের মতই আরেকটি ছায়াপথের
দেখা পাওয়া গেছে

এক সেকেন্ড মানে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল

পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মাপের আমি
এই দূরত্ব মাপতে মাপতে মরে যাচ্ছি

এতো বড় জগত কেমনে বানাইলা আল্লা!

আমার এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে
দেড় হাজার বর্গফুটের পিতা হতে গিয়ে
মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেল

অথচ

এই পঞ্চাশের ঘরে এসেই একটা মানুষ
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের পিতা হয়েছেন

মাত্র দুইজনের পিতার মাপের আমি
একটি দেশের পিতার বড়ত্ব
মাপতে মাপতে মরে যাচ্ছি

এতো বিশাল মানুষ কেমনে বানাইলা আল্লা!

সময়ের এপিটাফ-৪
শহিদ আজাদ

বিষাদ যাতনায় ভরপুর, সময়ের এপিটাফ,
বিপন্ন বিশুদ্ধ বাতাসের বিলাপ অভিশাপ,
চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ছন্নছাড়া মৌতাত উৎপাত,
নিষিদ্ধ কাব্যের কাহনে, যেন এক পরবাস।
দ্রোহের আগুন জ্বলে না, আর কোন হৃদয়ে,
যত্রতত্র নদীর পাড় ভাঙ্গে, উন্মত্ত জোয়ারে,
শত জনমের বিশ্বাস নষ্ট হয়, নিয়তির ভয়ে,
নিগুঢ় বেদনায় বেঁচে থাকা, যেন এক ভাগাড়ে।

এ জীবন কোন জীবন নয়, যেনো এক বন্দীশালা,
অঘোরে ঘুমায় সকলেই, যেন বাদুরের বংশধর!
চোখ খোলা নিষেধ আজ, আলস্য করেছে ভর,
কেউ খোলে না মুখ, সকলেই দিয়েছে মুখে তালা।
ভয়ভীতি আর হুমকি ধামকিতে অগণতান্ত্রিক,
নিষিদ্ধ বলয়ের মোক্ষম মন্ত্রে কোন্ সে তান্ত্রিক!

হরফ কাহিনী
জামসেদ ওয়াজেদ

রোসেটা পাথর গায়ে লেখা আছে হরফ কাহিনী
অশোকের শিলালিপি ঠিক তার পথ বাতলায়
চিত্র ভাব শব্দলিপি এভাবেই নিজ রূপ পায়
প্রাচীন ব্রাহ্মী হলো এশিয়ার লিপির জননী।

সেমেটিক জাতিগণ এই সব লিপির জনক
প্রাচীন ফনিক জাতি বাস করে আজকে কোথায়
তাদের অঙ্কিত পথে লিপিগুলো হেঁটে হেঁটে যায়
পুরাণের যতকথা কানে শুনে হই আচানক।

সভ্যতার নিদর্শন আমাদের আলোকিত করে
অতীতের শিল্পালয়ে খুঁজে পাই বর্ণের পাহাড়
সহস্র বছর ব্যাপী ঋদ্ধ হয় শব্দের আহার
আরো যদি তথ্য চাই তবে চলি শুরুর শেকড়ে।

লিপির উদ্ভব কবে জানা নেই কাল ক্ষণ দিন
আদিম জনের প্রতি বাড়ে শ্রদ্ধা বাড়ে শুধু ঋণ।

পাতাদের পিঠ থেকে
শিহাব শাহরিয়ার

এই উড্ডীন পতাকা আমরা রক্ত দিয়ে কিনেছি

আমাদের তিরিশ লাখ রক্ত বহন করেছে
বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনার মোহনা

হায়েনাদের বুলেটের ভয়াবহতা দেখেছে
রাজারবাগ, রায়েরবাজার, পিলখানা, পঞ্চগড়
হায়েনারা শস্যভূমিকে বিরাণভূমি–বধ্যভূমি করেছিল বলে
বালুচরের বাতাসেরা থুতু ছুঁড়েছিল জলপাই রঙের জিপে

শকুন ছাড়া সেদিন বাংলার সব পাখিরা উড়ে উড়ে
এক এক করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল পাতাদের পিঠ থেকে

আমাদের করোটির মাঠে সেদিন খেলা করেছে
ভয়ের দাবানল– ভূমির আঁচল জুড়ে জ্বলেছে আগুন
আমরা জন্মগ্রাম ছেড়ে সীমান্তের চোখে রেখেছি হাত

যাদের পিতৃত্বের অধিকার দিয়েছিলেন শেখ মুজিব
সেসব শ্যামলা মায়ের শরীরে বসেছিল নরপশুরা

ডিসেম্বর, ব্রহ্মপুত্র থেকে রক্ত নেমে গেল মেঘনার মোহনায়
যমুনায় এলো নতুন জল, পদ্মায় জেগে উঠল রূপালি ইলিশ

মানুষকে নয় মাস যারা কুকুর ও শকুনের খাদ্য বানিয়েছে
কোটি কোটি বছর, ঘৃণার পুকুরে তাদের দিয়েছে ডুবিয়ে

একটি অসমাপ্ত স্বপ্ন
মনসুর আজিজ

বিজয় একটি মুক্ত পাখির নাম
যার পালকে শোভিত সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি
চোখের প্রিজমে জমা আছে আগামীর স্বপ্ন
কিন্তু আমার সম্মুখে যে পাখিটি
তার বুকে লেগে আছে শিকারির রক্ত
যার ডানা দুমড়ানো জেটবিমানের পাখার মতো
আর ছোট্ট বাসাটির দখল নিয়েছে বাজপাখি
চোখ বেয়ে নেমে আসছে কষ্টের অশ্রুফোঁটা
তাকে কী করে বিজয় বলি!

বিজয়ের পাখিটির দিকে তাকিয়ে আমারও গৃহের কথা মনে পড়ে
প্রিয়জনের মুখ, শৈশব, কৈশোর, জীবন পঞ্চাশে ফেলে আসা যৌবন
আর সম্মুখে দিশাহীন প্রৌঢ়ত্ব আড়ষ্ট করে প্রত্যহ
স্বদেশের কতগুলো লুটেরার মুখ
চোখের সামনে ভেসে ওঠে পানকৌড়ির মতো
আবার মিলিয়ে যায় স্মৃতির অতলে!

তবুও একটি অসমাপ্ত স্বপ্ন–
লাল-সবুজ পতাকার ভিতর পতপত করে উড়তে থাকে অহর্নিশ।

ছোটগল্প

অন্য জন্মান্তর

রফিকুর রশীদ

শেষ শ্রাবণের মেঘলা আকাশ। রাতের প্রথম প্রহরে একটানা ঘণ্টা দুয়েক বৃষ্টি ঝরিয়েও মন ভরেনি আকাশের, অভিমানে মুখ গোমড়া করে আছে সেই কখন থেকে। উঠোনে থিকথিকে কাদা, আয়াত আলী তবু বারবার ঘর ছেড়ে সেই উঠোনে নেমে আসে, ঘাড় উঁচু করে আকাশের দিকে তাকায় এবং আঁতিপাঁতি করে কী যেন খুঁজে ফেরে। কী খোঁজে ঘোমটা টানা আকাশের গায়ে? উদ্দিষ্ট সেই বস্তু দেখতে না পেয়ে আবার রোয়াক পেরিয়ে ঘরে ঢোকে। অকারণেই ঘুমন্ত দুই কন্যার মুখে হাত বুলায়। টিয়া ঘুমের ঘোরে একটুখানি নড়েচড়ে ওঠে। পরী চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ঘুমের মধ্যেই বাবার আদর গ্রহণ করে।

অন্যান্য দিনে ওরা দু'বোনই দাদির কাছে ঘুমায়। আজ দাদির অনেক কাজ। দুই নাতনিকে ঘুম পাড়াবার পর রোয়াকের খুঁটিতে শাড়ি পেঁচিয়ে আঁচিঘর তৈরি করে ওদের আসন্ন প্রসবা মাকে ঢুকিয়েছে সেইখানে। তেল-পানি-আগুনের মালশা নিয়ে সে নিজে পাহারায় আছে–কখন কী হয়, বলা তো যায় না কিছুই! এদিকে গির্জা-বাড়ির ঘণ্টাধ্বনি নিরাকপড়া রাতের নিস্তব্ধ প্রহরকে ঠেলে নিয়ে চলে নির্ভয়ে। মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের আজান ইথার কাঁপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ঘর-উঠোন করতে করতে হয়রান আয়াত আলী, তবু আঁধারলিপ্ত আকাশের গায়ে পোয়াতি-তারার উদ্ভাস খুঁজে পায় না। তখন বিষণ্ন চোখে সে তাকায় শাড়ি-ঘেরা আঁচিঘরের দিকে। সেখান থেকে ভেসে আসে নারীকণ্ঠের যন্ত্রণা ক্লিষ্ট গোঙানি। নতুন এক পৃথিবী সামনে নিয়ে সে আছে প্রতীক্ষায়, কখন আসবে সে, মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে কখন আসে, কখন..কখন..।

এমনিতে আয়াত আলী খুবই সহজ-সরল সাদাসিধে মানুষ। সোজা কথাটুকু খুব সহজে বোঝে। ঘোরানো প্যাঁচানো জটিল কোনো বিষয় তার মাথায় ঢুকতেই চায় না। রাজনীতির জটিলতা মোটেই বোঝে না। তবু কী যে তার কপালের ফের, ঘুরেফিরে রাজনীতির প্যাঁচে তাকে পড়তেই হয়। এই যেমন তার মুক্তিযোদ্ধা হবার ব্যাপারটাই ধরা যাক, এ কি তার রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত ছিল? ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁসা এই ভবেরপাড়া বল্লুভপুর কেদারগঞ্জ থেকেও কত মানুষ মিছিল নিয়ে মেহেরপুরে গেছে, কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে কিংবা সামসুজ্জোহা পার্কে নেতাদের বক্তৃতা শুনে রক্ত গরম করে আবার গ্রামে ফিরেছে; আয়াত আলীকে কেউ কখনো দেখেছে এ সব মিটিং-মিছিলে? না, সে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করে, প্রচুর খাটাখাটুনির পর মুখের আহার জোটাতে হয় তাকে; মিটিং-মিছিল দিয়ে কী করবে সে! তবু তাকে সময়ের প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের মতো বিশাল এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ঠিকই জড়িয়ে পড়তে হয়। আবার এ নিয়ে সে ভেতরে ভেতরে প্রবল অহংকারও অনুভব করে। অহংকার তো সব মুক্তিযোদ্ধারই থাকার কথা। কিন্তু আয়াত আলীর অহংকারের জায়গাটা অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং আলাদা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবারও আগে আনসার বাহিনীর এগারজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সে কৃচ্ছার প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তারাই আবার মুজিবনগরে দাঁড়িয়ে দেশের প্রথম সরকার প্রধানকে গার্ড অব অনার দিয়েছে; তার অহংকারের শেকড়বাকড় এই ভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রোথিত। এ নিয়ে নানাজনের নানা কথা শুনতে হয়, সে শোনে, কিন্তু গায়ে মাখে না। অন্তর্গত অহংকারে সে উদ্ধত রাখে মাথা। বাইরে নয়, আয়াত আলী একাকী নির্ভৃতে পরাজিত হয় ভেতরের অদৃশ্য এক দুর্বলতার কাছে। ব্যাপারটা যতই হাস্যকর মনে হোক, তিন কন্যার প্রতি আয়াত আলীর স্নেহ-মমতার একটুও ঘাটতি নেই, তবু পুত্র তৃষ্ণায় খাক হয়ে পুড়ে যায় তার বুকের জমিন। যুদ্ধে যাবার আগেই সে পেয়েছে ময়নাকে, যুদ্ধের শেষ প্রান্তে এলো টিয়া; মেয়ে তো নয় যেনবা সে লালসবুজের পতাকা হয়ে আসে মুক্তিযোদ্ধা আয়াত আলীর ঘরে। আবার বছর দুয়েকের মাথায় আকাশ থেকে উড়তে উড়তে নেমে আসে পরী। পুত্র-প্রত্যাশায় অধীর হয়েছিল বটে, পরীবানুর ঘর আলো করা রূপ দেখে আয়াত আলী সেবারও অপ্রাপ্তির বেদনা ঢেকে রাখে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন। পুত্র আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে সে পীর ফকিরের কাছেও ধর্ণা দিয়েছে। এবার একটি পুত্রসন্তান চাই-ই-চাই। ময়নার মার পেটের আকৃতি দেখে অভিজ্ঞ মহিলারা আশ্বস্ত করেছে, তবু মনের ধুকপুকি যায় না তার।

দেখতে দেখতে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন গুটিয়ে নেয় রাত্রি। ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ভোরের আলো। তবু যেন আয়াত আলীর চোখের ঘোর কাটে না। নইলে ঘরের রোয়াক থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে যাবে কেন! সে তো এই কর্দমাক্ত উঠোনে নামা-ওঠা করছে সারারাত ধরেই। কই, আগে তো এমন পা পিছলানোর ঘটনা ঘটেনি! অবশ্য ওই মুহূর্তেই আঁচিঘর থেকে শিশুকণ্ঠের দুনিয়া-কাঁপানো 'ট্যাঁ' ধ্বনি আছড়ে পড়ে তার কর্ণকুহরে। তবে কি নবজাতকের কান্নাধ্বনির ধাক্কায় সে নিজের অজান্তে খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছিল! উঠোনের কাদাপাঁক থেকে কৌশলে উঠে দাঁড়াতেই আয়াত আলীর মা আঁচিঘরের পর্দা তুলে তারস্বরে ডেকে ওঠে, ও খোকা, তুই গেলি কুথায়?

আয়াত আলীর পিতৃপ্রদত্ত নাম খোকা নয়। যাকে বলে ডাকনাম, তাও নয় এটা। এতদঞ্চলে মা-বাবার সম্বোধনের ধারাই হচ্ছে এ রকম–খোকা কিংবা খুকি। বয়সে বাড়লেও তাদের ডাকহাঁকের বিশেষ হেরফের হয় না। বড় খোকা মেজো খোকা ছোট খোকা–এ রকম চলতেই থাকে। আয়াত আলীর মায়ের মুখের এ সম্বোধনও মোটেই নতুন কিছু নয়। তবু সে চমকে ওঠে মায়ের কণ্ঠ শুনে। লুঙির গিঁট ঠিক করতে করতে কোনোক্রমে জবাব দেয়–এই যে মা, আমি...

দাঁড়িয়ি আছিস ক্যানে বাপ, আজান দে।

মায়ের কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত আহ্বান শুনে আয়াত আলী শিউরে ওঠে– আজান দিতে হবে! নিজের কানকেই যেন অবিশ্বাস হয়। গতবার মানে টিয়ার জন্মের সময় তো সে ওজু-টজু করে একেবারে রেডি হয়েই ছিল। মনে তার অনেক আশা। গ্রামের অভিজ্ঞ দাই রহিমা খালা গভীর আস্থার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে মেওয়াফল। ফলে সেবার আজান দেবার দরকারই হয়নি। এবার মায়ের আহ্বানকে তো উপেক্ষা করতে পারে না আয়াত আলী! আঁচিঘরের দিকে তাকিয়ে আবেগ থরোথরো কণ্ঠে সে মাকে আবার শুধায়–আজান দেব মা!

নবজাতক শিশুটি কী যেন বলতে চায়। তীব্র কান্নার আড়াল থেকে তার সে বক্তব্য উদ্ধারে তৎপর দাদি আঁচিঘর থেকে সামান্য মুখ বাড়িয়ে বলে,

আজান দ্যাও বাপ! ইবার তুমার খোকা হয়িছে যে!

আজান দেবে কী, আয়াত আলীর তো ইচ্ছে করে আকাশের গায়ে ডিগবাজি দিতে। ইচ্ছে করে ভোরের আকাশ থেকে ডিমের কুসুমের মতো গোলাকার সূর্যটা নিয়ে এসে তার বৃদ্ধা মায়ের হাতে তুলে দিতে। আহা, দিঘলা রাত্রি শেষে এ কোন আনন্দবার্তা শোনালো তার মা-জননী! নিয়ম মেনে নামাজ-কালাম পড়া হয়ে ওঠেনি কোনোদিনই, তবু এই আজানাটুকুর জন্যে সেই কবে থেকে অপেক্ষা করছে আয়াত আলী। তাই আর বিলম্ব না করে কাদা-থিকথিকে উঠোনে দাঁড়িয়েই সে দুই কানে আঙ্গুল গুঁজে হেঁকে ওঠে–আল্লাহু আকবার...। উত্তেজনায় তার কণ্ঠ ভেঙেচুরে যায়। তবু সেই মধুর ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে ভোরের বাতাস। বাড়ির পেছনের বাঁশবাগান থেকে একঝাঁক পাখি ডানা মেলে উড়ে যায় আকাশ পানে। আজান শেষ করে আয়াত আলী রোয়াক পেরিয়ে ঘরে ঢুকে দুই মেয়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে–টিয়া পাখি ওঠো, পরীবানু ওঠো। কখুন সকাল হয়িচে, ওঠো!

দুই মেয়েকে জাগিয়ে তুলতে গিয়ে বড় মেয়ে ময়নার কথাও মনে পড়ে যায়। সে আছে ফুপু-বাড়ি। নিজের ছেলেমেয়ে নেই, ভাইয়ের মেয়েদের উপরে খুব দরদ একমাত্র ফুপুর। বাড়ি তার দূরে নয়। এ-পাড়া ও-পাড়া। ভাইয়ের বাড়ি এলেই যাবার সময় সে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় ময়না অথবা টিয়াকে। এবার পালা পড়েছে ময়নার। গতকাল সন্ধ্যায় সে গেছে ফুপুর সঙ্গে। কাজেই নতুন এই আনন্দ-সংবাদটি তাকে বাদ রেখে অন্য দু'জনকেই জানায় আয়াত আলী,

তুমাদের যে একটা ভাই হয়িচে! তুমাদের দ্যাখার জন্যি সে কাঁদছে। তাকে দ্যাখপা না তুমরা?

টিয়া এবং পরী দুজনেই লাফিয়ে ওঠে। এক নিমেষে চোখ থেকে ঘুমের জড়তা কেটে যায়। বাইরে থেকে ভেসে আসা শিশুকণ্ঠের কান্নাধ্বনি তাদের নিঃসংশয় করে দেয়। তখন আর তাদের ঠেকায় কে! দু'জনেই পা বাড়ায় ঘরের বাইরে। কী ভেবে টিয়া পাখি ঘুরে দাঁড়ায়, বাপের কাছে এগিয়ে এসে দাবি জানায়–আমাদের মিষ্টি খাওয়াবা না আব্বা?

মিষ্টি খাওয়াবে না মানে! আয়াত আলী তো ঘোষণা দিয়েই রেখেছে, পুত্রসন্তান হলে এই ভবেরপাড়া গ্রামের সবাইকে সে মিষ্টি খাওয়াবে। খ্রিস্টানপাড়ার লোজকনকেও বাদ দেবে না। তারা পড়শি, তাদেরও হক আছে বই কি! টিয়া পাখির মাথায় হাত রেখে মিষ্টি হেসে আশ্বস্ত করে সে,

হ্যাঁ, মিষ্টি তো খাওয়াবই। সারা গ্রামের লোককে খাওয়াব।

অবুঝ হয়ে আবদার করে টিয়া পাখি,

না, আমরা এখনই খাব।

আজ আর কোনো কিছুতেই না করে না আয়াত আলী। সোজা জানিয়ে দেয়, আচ্ছা আমি মিষ্টি আনতি যাচ্ছি। তুমরা যাও, ভাইকে দ্যাখো গা।

আর দেরি করে না আয়াত আলী। ঘর থেকে উঠোনে নেমে একচালা ছাপড়ার তলা থেকে সাইকেলটা বের করে আনে। যাবে সে কেদারগঞ্জের মোড়ে। স্বাধীনতার পর এ ক'বছরে দেখতে দেখতে জায়গাটা বেশ বাজার মতো হয়ে উঠেছে। ভবেরপাড়া থেকে এইটুকু পথ বেশ পায়ে হেঁটেই যাওয়া যায়। তবু সে তার মাডগার্ড খোলা হিরো সাইকেলটা সঙ্গে নিয়েই বেরোয়। যত তাড়াতাড়ি মিষ্টি এনে মেয়ে দুটোর সামনে ধরা যায় ততোই তারা খুশি হবে। ভাবনাটা একটু পরিবর্তন করে আয়াত আলী। মিষ্টি এনে প্রথমে সে তার মায়ের হাতেই তুলে দেবে। তারও একটা নাতির শখ অনেক দিনের। আজ প্রথমে তার মাকেই মিষ্টিমুখ করাবে, তারপর অন্যদের কথা। পাড়া-পড়শি যারা ছেলে দেখতে আসবে সবাইকে আজ মিষ্টিমুখ করাবে। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখতে গিয়ে হঠাৎ তার কাদামাখা পা হড়কে যায়। তখনই নবজাতক শিশুটি আবার কেঁদে ওঠে। আয়াত আলী কান খাড়া করে। পথের পাশে ভেজা দূর্বাঘাসের ডগায় পায়ের কাদা মুছতে মুছতে মনে হয়–ছেলেটার মুখ দেখার জন্যে তাকে যদি কেউ একবার ডাকতো! নিদেনপক্ষে টিয়া পাখিও যদি পিছন থেকে ডেকে বলতো–তুমি একবার ভাইয়ের মুখ দ্যাখবা না আব্বা? কিংবা টিয়ার দাদি যদি বলতো–অ বাপ, তুমার সুনার চাঁদ ছেইলিডার মুখটা দেইখি যাও দিনি!

নাহ্, কেউ তাকে ডাকেনি। মা বলেছে আজান দিতে, সে আজান দিয়েছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। সে নিজে মুখে কেমন করে পুত্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে মায়ের সামনে! সাইকেলে উঠতে উঠতে সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আচ্ছা যাক, মাকে মিষ্টি মুখ করানোর পরই না হয় দেখবে ছেলের মুখ। বিশু ময়রার দোকানের সবচেয়ে ভালো পদের মিষ্টি নিয়ে তবেই সে বাড়ি ফিরবে। পুনর্বার সাইকেলে উঠে বসার পর এতক্ষণে তার হঠাৎ মনে পড়ে, সাতসকালে দোকান খুলেছে তো বিশু ময়রা! আবার নিজেকে বুঝায়, দোকান না খুললেই সে ছেড়ে দেবে! বল্লভপুরে গিয়ে বাড়ি থেকে ধরে আনবে না তাকে! সে না থাকে তার ছেলে নিত্যকে সাইকেলে তুলে এনে দোকান খুলিয়ে নেবে। নিত্যর উপরে জোর খাটাবার মতো অধিকার তার আছে। আজ তার মিষ্টি না হলে চলবেই না।

ভবেরপাড়ার পরের গ্রাম মানিকনগর। কেদারগঞ্জ তারও পরে। তা সেই মানিকনগরে ঢোকার মুখেই নিমাই পালের সঙ্গে দেখা। বাপের বয়সী এই মানুষটিকে সে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে, আশ্চর্য হয়ে তার হাতের নিপুণ কাজ দেখে, মাটির প্রতিমা তার হাতে যেনবা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে; মুখের উপরে প্রশংসা করলে লাজনম্র ভঙ্গিতে সে বলে–মুসলমানের ছেলে হয়ে তুমি এ সবের কী বুঝবা বাপ! এভাবে বললেও মনে মনে সে আয়াত আলীকে যথেষ্ট ভালোবাসে। কাজের ফাঁকে ঠোঁটের কোণে বিড়ি ঝুলিয়ে নিজে থেকেই সে বুঝাতে চেষ্টা করে–বোধন কাকে বলে, দেবীর চক্ষুদান কখন ঘটে এই সব ধর্মীয় উপাখ্যান। সাতসকালে সেই মানুষের হঠাৎ এমন কী হলো কে জানে! আয়াত আলী পুত্রজন্মের সুসংবাদ জানাবার জন্যে সাইকেলে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে, একবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডেকে ওঠে–অ নিমাইকাকা! কাকা! কী আশ্চর্য, লোকটি যেন তাকে চিনতেই পারে না। একবার শুধু আয়াত আলীর মুখের দিকে তাকায়, তারপরই বাম দিকের রাস্তায় হনহন করে হেঁটে চলে যায়।

বিস্ময়ের অবধি থাকে না আয়াত আলীর। হঠাৎ নিমাই কাকার এমন আচরণের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না সে। মনে মনে খুব দুঃখ পায়। এত বড় সুসংবাদটা তাকে জানানোই গেল না! পাশাপাশি গ্রামের মানুষ বলে তো শুধু নয়, আয়াত আলীর বাবা বিলাত আলীর সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ছিল নিমাই পালের। নিজের ভাই নিতাই পাল আর সতীশ পাল বর্ডার টপ্‌কে ওপারে চলে গেলে বন্ধু বিলাত আলীকেই আঁকড়ে ধরে সে, সুখ-দুঃখের কত কথা যে গুনগুন করে শোনায় তার কি ইয়ত্তা আছে! শৈশব কৈশোরে এ সব দৃশ্য তো খুব কাছে থেকে দেখেছে আয়াত আলী! বাপের মৃত্যুর পরও নিমাই কাকার সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটা তো শুকিয়ে যেতে দেয়নি আয়াত আলী! হঠাৎ কোথায় কী যে ঘটে গেল তার আগা-মাথা কিছুই খুঁজে পায় না সে।

এমন একটা শুভদিনে ভারি মন খারাপ হয়ে যায় আয়াত আলীর। অথচ এটা তো ঠিক, তার পুত্রলাভের আনন্দ-সংবাদ জানতে পারলে নিমাইকাকারও মন ভালো হয়ে যাবে। তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে। সব কাজ ফেলে রেখে নাতি-দর্শনের জন্যে ছুটে যাবে ভবেরপাড়ায় তাদের বাড়ি। মানুষটাকে তো সে ভালোই চেনে। মাটির কাজ করতে করতে মনটা হয়ে গেছে মাটির মতো নরম। কী জানি কোথাও বড় কোনো ধাক্কা খেয়েছে কিনা! আয়াত আলী মনে মনে স্থির করে বাজার থেকে মিষ্টি নিয়ে ফেরার পথে নিমাইকাকাকে ঠিক ধরে নিয়ে যাবে। তখন নিশ্চয় জানা যাবে কেন তার মন খারাপ; কিসের জন্যে তাকে এ ভাবে মুখ ফেরাতে হলো।

মানিকনগর থেকে কেদারগঞ্জ কতটুকুই বা দূরত্ব। সাইকেলের প্যাডেলে কয়েক পাক ঘুরতে না ঘুরতেই সে পৌঁছে যায় কেদারগঞ্জ মোড়ে। বিশু ময়রার দোকানের চাটাইয়ের সাথে হেলান দিয়ে সাইকেলটা রাখার পর তার নজরে পড়ে মিষ্টির দোকানে শুধু নয়, বাজারের সব দোকানই প্রায় বন্ধ। শ্রাবণ আকাশ নুয়ে আছে, তবু বেলা যতটুকু ওঠার তা তো ঠিকই উঠেছে। কিন্তু শিলকড়ইয়ের ছায়ায় ঢাকা এই গ্রাম্য বাজারে প্রাণের স্পন্দন বলতে যেন কিছুই টের পাবার উপায় নেই। আয়াত আলী তখন কী করে! মিষ্টি না হলে যে তার চলবেই না। তবে কি সাইকেল মেরে বিশু ময়রার বাড়ি পর্যন্ত যাবে সে? নিত্যকে সাইকেলে তুলে নিয়ে আসবে বাজারে? বিশু ময়রার আগমনপথের দিকে চোখ সরু করে তাকাতে গিয়ে এতক্ষণে তার নজরে পড়ে পূর্বদিকে

নদীপাড়ে এক চায়ের দোকানে চুলো জ্বলছে গনগন করে। বেশ কিছু লোকজন গোল হয়ে ঘিরে আছে দোকানটা। সেই দোকানে সন্তোষ রেডিও বাজছে গমগম করে। আয়াত আলী পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। গোলাকার বৃত্ত ভেঙে একটা লোক রেগে মেগে বেরিয়ে আসে এবং হাতের আঙুলে ধরা চায়ের কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে–অসম্ভব! এ হতেই পারে না।

অসম্ভবটা কী?

সে উত্তর কর্কশ কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে রেডিও থেকে। কে একজন মেজর জনগণকে শান্ত থাকার এবং ঘর থেকে বাইরে না বেরোবার আদেশ জারি করছে। কেন, স্বাধীন দেশের মানুষ ঘরের বাইরে আসবে না কেন? কারণ রাতের অন্ধকারে তারা দেশের রাষ্ট্রপতিকে সপরিবারে হত্যার মতো অসম্ভব ঘটনা ঘটানোর পর জরুরি অবস্থা জারি করেছে। আকাশ ফাটানো বিদ্যুৎ চমকের মতো এ সব খবর শুনে আয়াত আলীর সারা শরীর কেঁপে ওঠে, হাতে পায়ে বল পায় না। রেডিও থেকে একই ঘোষণা বারবার প্রচারিত হচ্ছে। আয়াত আলীর কানও যেনবা বধির হয়ে যায়। এ অবস্থায় কী করবে সে? বিশু ময়রার দোকানের মিষ্টি কেনার কথা আর মাথায় আসে না তার। নবজাতক পুত্রের চেহারা এখনো সে দেখেনি। তবু তার আকর্ষণেই সে বাড়িমুখো রওনা দেয়। কিন্তু সাইকেলের প্যাডেল থেকে বারবার পা হড়কে যাওয়ায় ভয়ানক বিরক্ত হয়। সেই বিরক্তি প্রকাশের জায়গা না পেয়ে ক্ষোভে দুঃখে এতদিনের সাইকেলটা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে সে দৌড়ুতে শুরু করে। কেন যেন তার মনে হয় ঘাতকের কালো হাত বহুদূর বিস্তৃত, তার শিশুপুত্রটিকে হত্যা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। সেই কালো থাবা থেকে নবজাতককে রক্ষার জন্যেই সে দৌড়োয়।

দৌড়োতে দৌড়োতে মানিকনগরে এসে নিমাই কাকার মুখ মনে পড়ে যায়। স্মরণ করতে চেষ্টা করে, কী ছিল সেই মুখের মানচিত্রে? আতঙ্কের অগ্নিছায়া? হতাশার বিষণ্ন মেঘ, নাকি অন্য কিছু? এত বড় জাতীয় বিপর্যয়ের খবর সে কি তবে আগেই জেনেছিল? আয়াত আলীর ভাবনা হয়, তার পুত্রসন্তান লাভের সুসংবাদ এখন এই বিপর্যস্ত অবস্থায় কেমনভাবে গ্রহণ করবে নিমাই কাকা?

মুজিবনগর যাবার প্রধান রাস্তা থেকে সামান্য একটু দূরে নিমাই পালের বাড়ি। মানিকনগরের সেই মোড়ে এসে দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আয়াত আলী। কী করবে সে, যাবে কী নিমাই কাকার বাড়ি? কাকা যদি এখন সেই মূর্তিটার কথা জিজ্ঞেস করে তাহলে কী বলবে সে? যদি জানতে চায়–শেখ মুজিবের মূর্তিটা এখন কোথায় বসাই বলো তো বাপু! একটা মূর্তি বানাবার জন্যে সে তো কম জ্বালাতন করেনি!

ঢাকা থেকে বহু দূরের প্রত্যন্ত সীমান্ত মুজিবনগরে কখনো শেখ মুজিব আসেননি বলে তাঁর মূর্তি বানবার কথা উঠেছে। অতিচেনা বৈদ্যনাথতলা যেদিন মুজিবনগর হয়ে যায় সেই ঐতিহাসিক দিনে নতুন সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদান করেছে যে সব আনসার সদস্য, আয়াত আলী তাদের একজন। যুদ্ধের পর কেউ কেউ পরিহাস করে শুধায়–কাকে স্যালুট দিয়িছো তুমরা?

রাগে শরীর জ্বলে যায় আয়াত আলীর, এ কী একটা প্রশ্ন হলো! মুজিব কোট পরে মঞ্চে দাঁড়ানো নেতাদের সবাইকে তার শেখ মুজিব বলে মনে হয়েছে। চোখ বুজলে এখনো সে দিব্যি দেখতে পায়–সেদিন এই আমবাগানে দাঁড়িয়ে মনে মনে স্যালুট করেছে শেখ মুজিবকেই। মুজিব নেই, এ কথা মনেই হয়নি। অথচ সবাই বলে, তিনি এখানে আসেন নি। বছরের এই একটি দিনে তারা আশা করে, তিনি আসবেন। আয়াত আলী খুব জোর দিয়ে বলে, অবশ্যই আসবেন।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই, এখানে এই নিভৃত পাড়া-গাঁয়ে আসার সময় হয়ে ওঠেনি তাঁর। মনের দুঃখে আয়াত আলী আবদার জানিয়ে রেখেছে নিমাই পালের কাছে–এবার একটা মূর্তি গড়ে দিয়ো তো কাকা! আমরা ক'জনা ইবার না হয় শেখ মুজিবের মূর্তিকেই স্যালুট করব। প্রস্তাব শুনে হেসেছে নিমাই পাল।

নাহ্, আজ আর নিমাই কাকার সামনে গিয়ে কাজ নেই। আয়াত আলী দ্রুত পা চালায় বাড়ির পথে। ভবেরপাড়া এখনো খানিকটা দূরে। কিন্তু পথে মানুষজন নেই কেন! বেলা তো কম হয়নি! সবাই কি তাহলে রেডিওর ঘোষণা শুনে বাইরে বেরুনো বন্ধ করেছে! এভাবে বালিতে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করার কোনো মানে হয়!

আয়াত আলী বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতেই দুই মেয়ে তাকে জাপটে ধরে। সারা শরীর তার শিউরে ওঠে। টিয়া পাখি ঘাড় তুলে বাপকে প্রশ্ন করে, আমাদের ভাইডাকে তুমি দ্যাখবা না আব্বা?

শুরুতেই মিষ্টির কথা না তোলায় খুব স্বস্তি বোধ করে আয়াত আলী। মনে মনে ভাবে, কী যে ভুলো হয়েছে মেয়ে দুটো! বেশ হয়েছে। টিয়াপাখির মাথায় হাত রেখে সে বলে,

তুমাদের ভাই দেকতি কেমন হয়িচে মা?

ও আব্বা, একেবারে রাজা-বাদশার মতোন। সুনার চান্দের মতোন। চলো দ্যাখবা।

বাপের হাত ধরে হিড়হিড় টেনে আঁচঘরের সামনে নিয়ে আসে টিয়া। দাদিকে ডেকে বলে, এই যি দাদি, তুমার খোকা এসিছে।

কোলের পোঁটলা আরো একটু জড়িয়ে ধরে একগাল হেসে ছেলের সঙ্গে তামাশা করে টিয়ার দাদি, মিষ্টি কই বাপ! মিষ্টি না হলি তো তুমার খোকার মুখ দেখা হবে না।

মুখে যা-ই বলুক, নবজাতককে ঠিকই আয়াত আলীর হাতে তুলে দেয় তার মা। এতক্ষণে টিয়ারও যেন মনে পড়ে যায় মিষ্টির কথা। সেও দাবি করে, মিষ্টি কই আব্বা? মা এবং মেয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আয়াত আলীর দু'হাতের আঁচলায় ধরে রাখা শিশুপুত্রের মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। এরই জন্যে এতদিনের অপেক্ষা? চারিদিকে এত অন্ধকার তবু এত আলো! ভেতরে ভেতরে কী যে ওলোটপালোট হয়, তার দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুদানা। একটুখানি ফুঁপিয়ে ওঠে যেনবা। তার মা চমকে উঠে প্রশ্ন করে, কী হয়িচে বাপ তুমার?

সর্বনাশ হয়িচে মা।

সবার চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠা। মা-মেয়ে-স্ত্রী সবাই তাকিয়ে আছে আয়াত আলীর মুখের দিকে। কেবল নবজাতক আছে দু'চোখ মুঁদে, নিরুদ্বেগে। এরই মধ্যে শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় আয়াত আলী,

শেখ মুজিব বেঁচে নেই মা। তাকে হত্যা করা হয়েছে।

এইটুকু বলার পর আয়াত আলী চমকে ওঠে। নিজের কণ্ঠ নিজের কাছে অচেনা মনে হয়। সকালে রেডিওতে শোনা কর্কশ কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি যেনবা আছড়ে পড়ে তার বাগযন্ত্র দিয়ে। তখন প্রবল বিবমিষার উদ্রেক হয় তার ভেতরে। কিন্তু এ কী! তার মা যে চোখ বন্ধ করে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ছে! তখন কী করে আয়াত আলী? নবজাতক পুত্রকে অতিদ্রুত তুলে দেয় স্ত্রীর কোলে। তারপর বৃদ্ধা মায়ের চোখে পানির ঝাপ্টা দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে তৎপর হয়। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফেরামাত্র দু'হাতে বুক চাপড়ে বৃদ্ধা হাহাকার করে ওঠে–শেখ মুজিব নেই! শেখ মুজিব নেই!

'নেই'–এই সত্যটুকুই মানতে পারে না গ্রাম্য বৃদ্ধা, আয়াত আলীর মা। এমনিতে গত রাতে তার উপরে অনেক ধকল গেছে, সেই সঙ্গে বিরামহীন বিলাপ তাকে যথেষ্ট দুর্বল করে ফ্যালে। তবু নবজাতক নাতিটিকে তার কোলে চাই। স্নেহময়ী দুই হাত বাড়িয়ে বউমার কোল থেকে সে তুলে নেয় আদরের নাতিকে। রক্তিম দুই গালে এঁকে দেয় মমতার চুম্বন। তারপর কী যে উদয় হয় তার মাথায়, সহসা তার ছেলের চোখে চোখ রেখে গভীর প্রত্যয়ে ঘোষণা করে–মুজিবুর মরবে কেন হা বাপ! এই যে আমি তুমার খোকার নাম রাখছি মুজিবুর।

আকস্মিক এই ঘোষণা আয়াত আলীকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। ঘরের রোয়াক থেকে সে নেমে আসে উঠোনে। তার খুব ইচ্ছে করে আনসার বাহিনির অবশিষ্ট এগারজনকে ডেকে এনে উঠোনে দাঁড়িয়ে আবারও একটা গার্ড অব অনার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে। না হোক ১৭ এপ্রিল, আজকের এই দিনে মহান নেতার প্রয়াণে শেষ স্যালুট জানালেই বা ক্ষতি কী! কিন্তু আয়াত আলী সেই একাত্তরের সঙ্গীসাথীদের ডেকে হেঁকে যে একত্রিত করবে, তাঁর প্রিয় বাহন মাডগার্ড খোলা সাইকেলটি এখন পাবে কোথায়!■

আলেফ মন্ডলের বিজয় দর্শন

ফেরদৌস সালাম

বক্ষমান এ কাহিনীর নায়ক আলেফ মন্ডল ওরফে আলফু কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়। এটি আবহমান বাংলার প্রতিনিধিত্বকারী এক হতদরিদ্র পরিবারের খণ্ডচিত্র। যে মানুষটি বালক বয়সে শিশু শ্রমিক; অন্যের বাড়িতে বছরে মাত্র ৬০ টাকা বেতনে বেগার খাটতো। এখন শিশু শ্রম নিয়ে সচেতন বিবেক জাগ্রত হলেও একসময় তা ছিল না। বরং দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের বেঁচে থাকা ও পরিবারকে সহায়তার কর্মপ্রয়াস ছিল এটি। সেই হতদরিদ্র পরিবারেরই এক শিশু আলেফুদ্দিন ওরফে আলফু মন্ডল। শিশু বয়সে পড়া-শোনার সুযোগ পায়নি; যে এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে কাজ করার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আজ ৬০ এর কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। জীবনের নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সে এখন স্বাবলম্বী। বিত্তশালী না হলেও স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে গর্বিত। তার জীবনের বাস্তব আলেখ্য নিয়েই এ নিবন্ধের আয়োজন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ১০/১১ বছর। আমার এক চাচার বাড়িতে বছরকারী কামলা হিসেবে কাজ করতো। বছরে বেতন ৬০ টাকা। দুইটা তফন (লুঙ্গি) আর একটা গেঞ্জি। আলেফের বাবা খুব মিনতি করায় তার বাবাকেও একটা তফন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো। তার বাবা একসময় মন্ডল বাড়িতে কাজ করায় সে হয়ে গিয়েছিল সাবু মন্ডল। তার রেশ ধরেই আলেফুদ্দিনও হয়ে গেল আলেফুদ্দিন মন্ডল। এ বাড়িতে তার নাম হয়ে গেল আলফু। কাজের মধ্যে সরকার সাহেবদের বাড়ির সামনের পরিত্যক্ত ক্ষেতে ২টি দুধেল গাভি চড়ানো, সেগুলোর যত্ন নেয়া আর বৈঠকখানায় মেহমানদের ফুটফরমাশ খাটা। ছোটবেলা থেকেই আলফু বেশ চটপটে।

আজন্ম দরিদ্রতার শিকার আলফুর মনে হয়েছে এ ধরনের কাজের জন্যেই তাদের জন্ম। স্বাভাবিকভাবে তার কাজে সবাই বেশ সন্তুষ্ট। এ বাড়ির কর্তা ব্যক্তিদের একজন স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা। সে সুবাদে তৎকালীন পাকিস্তানের ৭০ এর জাতীয় নির্বাচন মুহূর্তে এ বাড়িটি হয়ে গেল আওয়ামী লীগ অর্থাৎ নৌকার ঘাটি। আলফু খুব ফুর্তিতে চা-বিস্কিট-পান-হুকো পরিবেশন করতো। আশেপাশের দলীয় লোকের আড্ডা। মাঝে মাঝেই ভোটের জন্য মিছিল– আমার ভাই তোমার ভাই অমুক ভাই অমুক ভাই। ভোট দিবেন কিসে– নৌকায় নৌকায়। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু। আলফু একসময় মিছিলের লোক হয়ে গেল। গগনবিদারী স্লোগানে পটু হয়ে গেল সে। চুঙ্গা ফুঁকিয়ে সে-ই প্রথম আওয়াজ দেয়, অন্যেরা তার তালে তালে সুর মেলায়- স্লোগান দেয়। কাজের ক্ষতি হলেও তার মালিক আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জব্বার মিয়া খুশিই হন এবং মাঝে মাঝে উৎসাহও যোগান। এতে আলফুর সম্পৃক্ততা বাড়ে, তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে মিছিল আর মিটিং।

৭০ সালে নৌকার প্রার্থী ভোটে জেতায় তার সেকি খুশি! জায়গায় জায়গায়, হাট-বাজারে তার এক কথা– আমরা পাস করছি। জুব্বার মিয়ার ক্যান্ডিডেট পাস করছে। ওকে সবাই চেনে, আদরও করে। এই ভোটের মিছিলে গিয়ে সে চা এবং বিড়ি খাওয়া রপ্ত করেছে। কিন্তু বড়দের সামনে কস্মিনকালেও তা সে টানে না। আলফু ভাবছিল ভোট-ভোট করে তার চাকরিটা বোধ হয় গেলো, মালিকের দেয়া কাজতো সে সেভাবে করতে পারেনি। কিন্তু না, পরের বছর এই বাড়িতেই তার বেতন দ্বিগুণ হয়ে গেল।

নির্বাচনের পর এ বাড়িতে সকাল বিকাল লোকের হাট বসে। ব্যস্ততা বেড়ে যায় আলফুর। চা পান সিগারেট বিড়ি দিয়ে আতিথ্য চলে। জেলা শহর টাঙ্গাইল ও ঘাটাইল থানা শহর থেকেও লোকজন আসে। দূরের লোকজন এলে আহারের ব্যবস্থাতেও তাকে সম্পৃক্ত হতে হয়। কিন্তু না, আলফু লক্ষ্য করে সবার মধ্যে কেমন যেন চাপা ক্ষোভ। জানতে পারলো, ভোটে জয়ী হলে কি হবে পাকিস্তানি রামছাগলরা গদি ছাড়তে চায় না। তার মালিক জব্বার মিয়া পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে একদম দেখতে পারতো না। বলতো, ও বেটারা রাম ছাগল। আলফুও তাদের তাই বলতো।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসমাবেশ ডাকলেন। এলাকার নেতা হিসেবে জুব্বার মিয়া সেই মিটিংয়ে যাচ্ছেন। আলফুর খুব ইচ্ছা হলো তাকেও সাথে নিয়ে যেতে বলে। কিন্তু সাহস হলো না। টাঙ্গাইলের এই গ্রাম বারইপাড়া থেকে তখন ঢাকা অনেক দূর। এ গ্রামের এই পরিবার ছাড়া তখন কেউ ঢাকা গিয়েছে কিনা তার জানা নেই। এ বাড়ির বালক সদস্যদের কাছে ঢাকার অনেক গল্প শুনে তার মনেও ঢাকা যাবার প্রবল ইচ্ছে জেগেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে শোনার জন্য এই বাড়িতে লোক ভর্তি হয়ে গেল। আলফুর খুশি আর ধরে না, কি জ্বালাময়ী ভাষণ! যেনো এ ভাষণে আকাশও কেঁপে উঠছে। কি কথা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আলফু মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা এই শব্দগুলোর অর্থ বোঝে না, কিন্তু সবার সাথে সেও অজানা আনন্দে আত্মহারা হয়ে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো।

কিন্তু না, এখানেই এই উত্তেজনা উদ্দীপনার শেষ হলো না। সে অবাক হয়ে দেখলো, সবাই কেমন অজানা আতঙ্কে চুপ হয়ে যাচ্ছে। ফিস ফিস করে কথা

বলছে। জুব্বার মিয়া লোকজনদের বলছে ওরা ক্ষমতা ছাড়বো না। দেইখো ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু তো বলেছেনই– যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। আমরা ওদের ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। পানিতে মারবো কথাটা মনে হতেই আলফুর বেশ হাসি পায়। বেটারা সত্যিই রাম ছাগল, সাঁতার জানে না। প্রতিদিনই রেডিওতে খবর শোনে সবাই। শুধু ঢাকার খবর নয়, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনতে উঠানে লোক ভর্তি হয়ে যায়। তখন এ গ্রামে মোটে ৩/৪টি রেডিও ছিল। তবে সবাই নেতার বাড়িতে এসেই শুনতো । কারণ চা পান বিড়ি পাওয়া যেতো।

২৫ মার্চের পরদিন বিবিসির খবরে জানতে পারলো ওরা বঙ্গবন্ধুরে গ্রেফতার করেছে। ঢাকায় হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে, বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কসাইখানা বানিয়েছে। স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। ঢাকা থেকে পাকিস্তানের আর্মিরা টাঙ্গাইলের দিকেও আসছে। হিসাব মেলে না আলফুর। এই যে গ্রামে মেম্বার চেয়ারম্যানের ইলেকশন হয়– যে ভোটে জিতে সেই চেয়ারে গিয়ে বসে। এখানে আবার কোন হিসাব? বেটারা কেন গদি ছাড়বো না!

ক'দিন পরই আলফু দেখলো এই বাড়িতে বল্লা ও কালিহাতী থেকে ৪টি হিন্দু পরিবার আশ্রয় নিলো। পাকবাহিনী গুলি করে বল্লার মাখন কর্মকার এক ছেলেকে মেরে ফেলেছে। মাখন বাবুর সাথে এ বাড়ির যোগাযোগ অনেক বছরের। এ বাড়ির সকল গয়নাই বছরের পর বছর ধরে মাখন বাবুই করেন। মাখন বাবুর এক ছেলে ডাক্তার। তার স্ত্রীর সন্তান হবে। সবাই খুব আতঙ্কিত, কান্নাকাটি করছিল। কালিহাতী হামিদপুরের নাড়ু সাহা ও আরো দুইটি পরিবারও এ বাড়িতে উঠে এসেছে। এ বাড়ির লোকজনও অজানা আতঙ্কে রয়েছে।

এর মধ্যেই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাকবাহিনীর শেলের আঘাতে পাশের গ্রাম করিমের পাড়ার ওয়াহেদ মাস্টারের মৃত্যু সে স্বচক্ষে দেখে বেশ আতংকিত হলো। একদিন একদল লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ বাড়িতে আশ্রয় নিল। আলফু জানলো এরা মুক্তিবাহিনী। ওদের দেখে আলফু বেশ আনন্দিত। যারা আমাদের দেশের মানুষদের মারছে, যারা বঙ্গবন্ধুরে গ্রেফতার করছে তাদের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করছে। মেহমানদারিতে লেগে গেল আলফু। জানলো এদের ৫০ জনের দলকে বলা হয় প্লাটুন। কমান্ডারের নাম তোফাজ্জল। আর কোম্পানি কমান্ডার লোকমান। বাড়িতে অনেকগুলো টিনের ঘর। একটা খালি করে দেয়া হলো থাকার জন্য। নিচে খড় বিছিয়ে তার ওপর কাঁথা আর তোষক দেয়া হলো। অনেকের ভাগ্যে তাও জুটলো না। শুধু খড়ের মধ্যেই থাকতে হলো। অবস্থাসম্পন্ন পরিবার হিসেবে এ বাড়ির শরীকসহ গ্রামের লোকজনও মাঝে মাঝে পালা করে খাবার দিতে থাকে। বাড়ির উঠোনে 'আমার সোনার বাংলা' গান গেয়ে জাতীয় পতাকা উড়ানোর সময় মুক্তিযোদ্ধা ও এ বাড়ির ছেলেদের সাথে আলফুও হৃদয় দিয়ে গানটি গায়। এই গান শুনলে তার ক্ষুধা চলে যায়। এখন আর তাকে বাড়ির অন্য কাজ করতে হয় না। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিবেদিত সে। এর মধ্যে শোলাকিপাড়ার যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা বদিউজ্জামান তোতা আহত হলে তাকে এই বাড়িতেই নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসা করেন এই বাড়িরই ডাক্তার আজমত আলী। মুক্তিযোদ্ধা সামাদ এবং এ বাড়ির ছেলে সালাম সারাক্ষণই তার সেবা শুশ্রুষা করে। তার সালাম ভাই আবার টাঙ্গাইল থেকে ওষুধ ও ব্যান্ডেজ নিয়ে আসে। আলফুও আহত মুক্তিযোদ্ধার সেবাযত্ন করে আনন্দ পায়।

১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল জেলা হানাদার মুক্ত হবার খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জানতে পেরে গ্রামের মানুষের সে কি আনন্দ। এ বাড়িতেও জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি ওঠে আকাশ কাঁপিয়ে। আলফুর শীত চলে যায়। সে তার শার্ট খুলে বাহির বাড়িতে নাচতে থাকে। এর মধ্যে আহত মুক্তিযোদ্ধা বদিউজ্জামান তোতা, সামাদ ও এ বাড়ির স্বেচ্ছাসেবকরা বাহির বাড়িতে দাঁড়িয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে উল্লাস প্রকাশ করে। এই গুলির শব্দ আলফুর কাছে ভয়ের না হয়ে আনন্দের হয়ে যায়। এর ক'দিন পর ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার সংবাদে আলফু জয় বাংলা জয় বাংলা বলে বিজয় মিছিলের সাথে ৪ কিলোমিটার দূরে হামিদপুর গিয়ে মিষ্টি খেয়ে এসেছিল। এই হলো মুক্তিযুদ্ধ সময়ের আলফু।

স্বাধীন দেশে ও অনেক কিছুর সাক্ষী। ও দুর্ভিক্ষ দেখেছে। দেখেছে না খাওয়া মানুষের মৃত্যুর মিছিল, দেখেছে লঙ্গরখানা, দেখেছে জাসদ গণবাহিনীর হত্যাকান্ড, শুনেছে রক্ষী বাহিনীর নির্যাতনের কথা। ও তখন ভেবেছে এইডাই কি সুখ পাবার স্বাধীনতা! ওর মালিক জব্বার মিয়া ওকে খুব আদর স্নেহ করতো। এই দুঃসময়ে তাকে কোনো কষ্ট করতে হয়নি। লঙ্গরখানায় যেতে হয়নি। তবে তার বুকটা ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল ৭৫ এর ১৫ আগস্ট। জাতির জনকের হত্যার খবর শুনে জব্বার মিয়ার মতো সেও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যিনি স্বাধীনতা এনে দিলেন তাকেই হত্যা? কি করে সম্ভব! এতো অকৃতজ্ঞ এ জাতি! ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটার পর আবার সব কিছু স্বাভাবিক হতে থাকে। আলফু রাতের বেলা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে অক্ষর জ্ঞান অর্জন করে নাম লিখতে শিখে। নিজেকে মনে হতে থাকে শিক্ষিত। একটু বড় হলে তার বিয়ের প্রস্তাব আসে। মেয়ে পাশের গ্রামের। জব্বার মিয়ার ব্যবস্থাপনাতেই বিয়ে হয় তার। আলফুর শ্বশুরের পুত্র সন্তান না থাকায় সে ঐ বাড়ির পুত্র হয়ে যায়। বছরের কামলার কাজ ছেড়ে শ্বশুরের জমি ও অন্যের জমি বর্গা চাষ করে আলফু ওরফে আলেফুদ্দিন স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এভাবেই একদিন তার ছেলে চাকরি নিয়ে বিদেশে যায়। মেয়েটা সরকারের শিক্ষা সহায়তার সুযোগে এইচএসসি পাস করে। এখন সে প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা। ভালো বিয়ে হয়েছে। আলেফুদ্দিন উপলব্ধি করতে পারে, দেশ স্বাধীন হবার কারণেই দেশের মানুষ এরকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে।

এনজিওদের কাছে আলেফুদ্দিন খুব কৃতজ্ঞ। একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়েই সে তার ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে পেরেছে। যে আলফু এক সময় বছরে ৬০/৭০ টাকা বেতন পেতো তার ছেলে মাসে বেতন পায় ২৫/৩০ হাজার টাকা। তবে আলফুর মধ্যেও মাঝে মাঝে অনেক বিষয়ে হতাশা কাজ করে। আলেফুদ্দিন বুঝতে পারে না, যে দেশের মানুষ রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে সে দেশে কেন দুর্নীতি হয়। কেন ধর্ষণ হয়। স্বাধীনতার চেতনা থেকে জাতি কেন দূরে সরে যাচ্ছে। এসব ভাবতে গেলে তার খুব কষ্ট হয়। আবার তখন সে দেখে দেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, মানুষের আয় বেড়েছে, প্রচুর মানুষ নানা ধরনের কাজের সুযোগ পাচ্ছে, উন্নত রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, চলাচল সুবিধা বেড়েছে তখন তার মধ্যে স্বাধীনতা নিয়ে এক ধরনের আশার সঞ্চার ঘটে।

২০১৯ সাল। আলেফুদ্দির খুব ইচ্ছে হলো বিজয় দিবসে ঢাকা দেখবে। শুনেছে সারা ঢাকা শহরে আলোকসজ্জা করা হয়। ইচ্ছা অনুযায়ী বিজয় দিবসের আগের দিন আলেফুদ্দিন এলো সেই শিশু বয়সের মালিক জুব্বার মিয়ার এক আত্মীয়ের বাসায়। এ পরিবারের সদস্যরা আলফুকে কখনো ভুলতে পারেনি। তাকে পরিবারের একজন হিসেবেই সম্মান করে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন একজন তাকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে নিয়ে গেল। আলফু অবাক হয়ে গেল এতো মানুষের ভিড় আর আনন্দ দেখে। তারাও একটা দলের সাথে মিশে ফুল দিল স্মৃতিসৌধে। এরপর রাতে তাকে ঢাকা শহরের আলোকসজ্জা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলো। এত বিশাল বিশাল রাস্তা, দোতলা, তিনতলা রাস্তা দেখে তো অবাক! গ্রামে থেকে বুঝতেই পারেনি দেশ এতো এগিয়ে গেছে। আবার নাকি হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে পদ্মা সেতুও বানাচ্ছে! মতিঝিল ব্যাংক পাড়া, হাইকোর্ট চত্বর আর রাস্তায় রাস্তায় নানা ধরনের বাতির ঝলমলানি। ওর মনে হলো এইটাই বুঝি আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের বিজয় আনন্দ। খুশি মনে বাসায় ফিরে যখন টিভিতে খবর দেখলো এ দিনেও বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু, প্রতিপক্ষের হাতে মৃত্যু, শিশু ধর্ষণের ঘটনা; তখন তার সেই চুঙ্গা ফুঁকিয়ে বলতে ইচ্ছে করলো– হায়রে মানুষ, এই স্বাধীনতার জন্য, এই বিজয়ের জন্য এক সাগর রক্ত দিলাম– কতো সংগ্রাম হলো তবু তোরা মানুষ অইলি না।■

জাকির ভাই শতায়ু জীবন চাই...

এম. মুকিতুল ইসলাম

জাকির ভাইকে প্রায় ৩০ বছর ধরে কাছ থেকে দেখছি। কখনো উদ্দীপনাদাতা লিডার ও সহকর্মী হিসেবে, কখনো স্নেহময় বড় ভাই হিসেবে। দু'জনে একদিকে যেমন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল চষে বেড়িয়েছি কর্মসূচির প্রয়োজনে তেমনি ঘুরেছি দেশের বাইরে গণচীন, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে। সহমর্মী একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে পেয়েছি নানা ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা। জন্মদিন উপলক্ষ্যে লিখতে গিয়ে সম্পাদকের বেঁধে দেয়া সাতশ' শব্দের মধ্যে জাকির ভাইয়ের উপর লেখাটি আসলে কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করবো তা নিয়ে পড়েছি সংশয়ে! ১৯৯০ সালের শুরুতে তদানিন্তন বাংলাদেশ বেকার পুনর্বাসন সংস্থায় কাজের শুরুর দিন থেকেই জাকির ভাইয়ের সাথে পরিচয়। পদ পদবীর দিক দিয়ে আমার ঊর্ধ্বতন কিন্তু পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই কেমন করে যেন তিনি আমার আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, মিশুক ও আন্তরিকতা দিয়ে মুহূর্তেই অচেনা মানুষকে আপন করার এক জাদুকরী ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। অত্যন্ত উদার কিন্তু প্রচারবিমুখ ব্যক্তিত্ব যিনি ঝড়ে বিধ্বস্ত ও দিকহারা 'বাংলাদেশ বেকার পুনর্বাসন সংস্থাকে' কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মী নিয়ে আজ 'বুরো বাংলাদেশ' নামক দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির জন্ম দিয়েছেন। বুরো টাঙ্গাইল প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর অনেক নিকট বন্ধু বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতার কথা বলে নিরুৎসাহিত করলেও তিনি নিজ সংকল্প থেকে পিছিয়ে আসেননি।

পূর্বের সংস্থার প্রায় ৫০ লাখ টাকার দেনা মাথায় নিয়ে তার নেতৃত্বে শুরু হয় নতুন সংস্থা বুরো টাঙ্গাইল-এর কাজ। পুরাতন সংস্থাকে দেয়া দাতা সংস্থা প্রিপ/প্যাক্টের অনুদানকে নতুন সংস্থার অনুকূলে আনার পিছনে তার নেতৃত্ব জোরালো ভূমিকা রেখেছিল। আজ আমরা অনেকে বুরো'র সুউচ্চ নান্দনিক নতুন ভবনে চকচকে অফিসে কাজ করছি, মাঠ পরিদর্শনে গাড়ি ব্যবহার করছি, শুরুতে তা ছিল না। শুরুর দিকে প্রচণ্ড কষ্ট আর আত্মত্যাগের মধ্যে জাকির ভাইয়ের নেতৃত্বে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করতে হয়েছিল। ভোরে সামান্য নাস্তা করে সারাদিন মাঠে কাটিয়ে রাতে আস্তানায় ফেরা। দুপুরে কোনদিন খাবার খেতাম রুটি-কলা আবার কোনদিন ফলমূল। বুরো'র উপদেষ্টা গ্রাহাম রাইটের সহায়তায় পাঁচটি মডেল শাখা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা একটি নতুন ধরনের 'স্বনির্ভর সঞ্চয়' ও 'ঋণ মডেল' বাস্তবায়নে আমরা তখন দিনরাত কাজ করে চলেছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সদস্যদের কাছ থেকে যে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা নিতো, ঋণ থাকা অবস্থায় সদস্যরা তা ফেরত নিতে পারত না। সঞ্চয় উত্তোলনের চিরায়ত রীতি পরিবর্তন করে বুরো চালু করে গ্রাহকবান্ধব এক নয়া পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সদস্যদের কাছে ঋণ থাক বা না থাক প্রয়োজনে মাত্র বিশ টাকা অবশিষ্ট রেখে সম্পূর্ণ টাকা যেকোনো সময় উত্তোলন করতে পারবে। এ সময় জাকির ভাইসহ আমরা ৫টি মডেল শাখার কর্ম এলাকায় প্রায় প্রতিটি গ্রামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো ভ্যানে করে প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করতাম। সে সময় কষ্টকর আনন্দের দিনগুলো জাকির ভাইয়ের সান্নিধ্যে কিভাবে কেটে যেত তা ভাবাই যায় না।

জাকির ভাইয়ের সাহচর্যে আধপেট খাওয়া শরীর নিয়ে কখন যে দিন পার হয়ে যেত তা টের পেতাম না। জাকির ভাইয়ের প্রাণবন্ত হাসি ও অমায়িক ব্যবহার যেকোনো মানুষকে মুহূর্তে কর্ম উদ্যমী করে তুলতো। শূন্য থেকে শুরু করা বুরো আজ তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে দেশ-বিদেশে সুনাম ও প্রশংসা কুড়াচ্ছে এবং একই সাথে একদিকে যেমন দেশের প্রায় ২০ লাখ সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে, অন্যদিকে সংস্থার প্রায় ১০ হাজার যুব ও যুব মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

মোশাররফ (এম. মোশাররফ হোসেন, পরিচালক–অর্থ), সিরাজ (মো. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি)সহ আমরা যখন জাকির ভাইয়ের সাথে কাজ করতাম তিনি যে নির্বাহী পরিচালক তা কখনো বুঝতে দিতেন না। অর্থাৎ টিমকে নিয়ে সুন্দর ও সুচারুভাবে যে

কোনো কাজ করিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন যোগ্য নেতা। তিনি সর্বস্তরের মানুষকে অত্যন্ত সম্মান করেন, এখন পর্যন্ত দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবাইকে আপনি বলে সম্বোধন করেন। প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে কখনো কার্পণ্য করেন না। একজন দক্ষ সংগঠকের যতগুলো গুণাবলী প্রয়োজন সবই তার মধ্যে রয়েছে।

আত্মপ্রত্যয়ী এই ব্যক্তিত্বের মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করার রয়েছে এক জাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে। তিনি মানুষকে সহায়তা করতে ভালোবাসেন। টাঙ্গাইলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু লোক তাঁর থেকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে। কারো সন্তানের পড়ালেখা, কারো মেয়ের বিয়ে, কারো চিকিৎসাসহ যে কোনো ধরনের সাহায্য চেয়ে জাকির ভাইয়ের কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে গেছে এমন নজির নেই। দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষ যখন প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে থাকে তখন সেখানেও সংস্থার মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণে তার উদ্যোগ চোখে পড়ার মত। প্রচারবিমুখ আপাদমস্তক এই উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব এসব কাজে নিজেকে সবসময় আড়ালে রাখতে পছন্দ করেন।

জাকির হোসেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাও আবার পুত্র সন্তান। জানা যায় অত্যন্ত মেধাবী কিন্তু প্রচণ্ড রকমের জেদি ও একগুয়ে ছিলেন বাল্যকালে। তার জেদের কাছে অনেককে অনেক কিছু ছাড় দিতে হতো সে সময়। হয়তো তাঁর এই জেদ বা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসই বুরো বাংলাদেশ নামক এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিষ্ঠা করে আজ এতদূর টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে। বুরো বাংলাদেশ-এর প্রধান কার্যালয় থেকে শাখা পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার কর্মী, পরিচালক থেকে মাঠ সংগঠক সবার সাথে তাঁর একই রকম হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। যে কোনো কর্মী নিঃসংকোচে তাঁর সুখ-দুখের কথা জাকির ভাইয়ের কাছে শেয়ার করতে পারে। তাঁর মনের এই ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রুত একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। শুরুর দিকে অনেক প্রশংসনীয় উদ্যোগকে তিনি প্রচারে আনতে দিতে না চাইলেও একটি বড় সংস্থা হিসেবে এখন বিভিন্ন মিডিয়া বা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর নিজের কিংবা বুরো বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে প্রচারবিমুখ এই মানুষটি তা সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে পরিচালকদের এগিয়ে দেন।

তাঁর স্বপ্ন ছিলো দেশের প্রান্তিক মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরবে না। সংস্থার কার্যক্রম দেশের দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাবে, তারা বুরো'র কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে না; হবে বাসস্থান, নিশ্চিত হবে চিকিৎসা সেবা, সন্তানরা পাবে লেখাপড়ার সুযোগ। বুরো বাংলাদেশ এর মাঠ কার্যক্রমে শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও স্বাস্থ্য সেবাকে আরো অর্থবহ করতে তাঁর নেতৃত্বে টাঙ্গাইলে শুরু করা হয়েছে বুরো হেলথ কেয়ার নামে বুরো বাংলাদেশ-এর সদস্যসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সম্বলিত একটি হাসপাতাল।

স্বাপ্নিক এই উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে এসএসসি পাসের পর বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু করেছেন। তাঁর স্বপ্ন আরো বড় পরিসরে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার। যেখানে স্বল্প ব্যয়ে দেশের মানুষ সকল প্রকার চিকিৎসার সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের উপকণ্ঠে জমি কেনা হয়েছে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে। রুচিশীল মানুষটি দেশের প্রতিটি বিভাগসহ প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। এই কেন্দ্রে একদিকে যেমন বুরো'র সদস্য ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের আধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকবে তেমনি দেশ-বিদেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তাঁর স্বপ্ন পূরণে ইতোমধ্যে মধুপুর, ফরিদপুর ও কুমিল্লার ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে। বগুড়া, রংপুর, নোয়াখালী ও টাঙ্গাইলের কাজ চলমান রয়েছে। এসব ভবনের নান্দনিক নির্মাণশৈলী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বুরো'র ভাবমূর্তি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

জাকির ভাইয়ের বয়স প্রায় ৬৫ বছর। স্বপ্নের কাজগুলো শেষ করে যাওয়ার ক্ষেত্রে বয়স একটি বড় বাঁধা। মাঝে মাঝে আমাদের অনেকের মনে হয় তিনি যেন শতায়ু হয়ে সুস্থতার মধ্যদিয়ে বুরো বাংলাদেশকে সবদিক দিয়ে সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন। বুরো'র সকল কর্মী, সদস্যসহ আপামর জনগণের কাম্য তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন। তার সুদীর্ঘ সুস্থ জীবনে চলমান কাজগুলো একদিকে যেমন পূর্ণতা পাবে তেমনি দেশের বহু মানুষ তাঁর এ কর্ম থেকে উপকৃত হবে। জয়তু জাকির হোসেন। মহান আল্লাহ আপনাকে সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন দান করুন।

৩১ ডিসেম্বর শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জাকির হোসেনের জন্মদিনে আমার শুভেচ্ছা। শুভ হোক আপনার জন্মদিন– শুভ জন্মদিন।■

● প্রধান, অবকাঠামো উন্নয়ন
বুরো বাংলাদেশ

কোচদের একাল-সেকাল

জয়নাল আবেদীন

বাংলাদেশে পঞ্চাশটির অধিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস। এর মধ্যে কোচরা অনন্যম। ভাষা, সংস্কৃতি, দৈহিক অবয়ব এবং জীবনজীবিকার ভিন্নতার কারণে কোচরা দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি থেকে একটু আলাদা সত্বার অধিকারি। তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গোষ্ঠি সংগ্রাম স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। তবে কোচরা সময়ের আবর্তে দিন দিন তাদের আদি ভাষা ও বর্ণমালা অনেকটা হারিয়ে ফেলছে। তাদের সিংহভাগ এখন বাংলাকেই মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহন করছে। ফলে তাদের চিরায়ত সংস্কৃতি অনেকটাই লোপ পেতে যাচ্ছে। জীবনজীবিকার কঠিন সংগ্রামের পাশাপাশি নিজের সংস্কৃতি রক্ষার যুদ্ধেও অবতীর্ন হচ্ছে তারা। এ যেন ঘরেবাইরে টিকে থাকার নিরন্তর লড়াই।

নৃ-বিজ্ঞানী বুকানন হ্যামিল্টন, হডন এবং ই. এ. গেইট এর মতে, কোচরা বৃহত্তর মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠির বোডো শাখাভূক্ত। আবার কারো মতে তারা মোঙ্গলীয় মহাগোষ্ঠির তিব্বতীয় বর্মন শাখাভূক্ত। রোভারেন্ট এনঞ্জেলসের মতে, কোচ, মেছ, বোডো, ধীমাল, গারো, হাজং, লালুংরা আদি কাছারী জাতির বংশধর। গ্রীক পরিব্রাজক টলেমী খ্রীস্ট জন্মের দ্বিতীয় দশকে কামরুপ অঞ্চলে কোচসহ ৯ জাতিগোষ্ঠির বসবাসের কথা উল্লেখ করেছেন। নৃ-বিজ্ঞানী রিজলী ও ডাল্টনের মতে, কোচরা দ্রাবিড় গোষ্ঠিভূক্ত।

বাংলাদেশে কোচরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত হলেও আসামে কোচরা একটি প্রধান হিন্দুবর্ন বা জাতি। আসাম তথা কামরুপে বহু বছর বসবাসের পর তারা কোচবিহার রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কোচবিহারের আদিনাম বধুপুর। কোচরা এ বধুপুরে রাজত্ব স্থাপন করে প্রায় চারশো বছর অবস্থান করে। তখন থেকে কোচবিহার নামের সাথে মিল রেখে জাতিগোষ্ঠির নামকরন হয় কোচ। কোচরা পরবর্তীতে কোচবিহার থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহের ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়, সিলেটের সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরে ছড়িয়ে পড়ে। চর্তুদশ শতকে কোচরা বৃহত্তর ময়মনসিংহে রাজত্ব স্থাপন করে। শেরপুরের দশকাহানিয়া পরগণার গড় জরীপাকে রাজধানী করে এক কোচ রাজ্য গড়ে তোলে তারা।

বর্তমানে ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর এবং মধুপুর গড়ের মধুপুর, ভালুকা, ঘাটাইল, সখিপুর, কালিয়াকৈর ও সাভার উপজেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করছে কোচরা। আদিবাসী নেতা খগেন্দ্র হাজংয়ের 'কোচজাতির ইতিহাস' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, উত্তর বঙ্গের রাজবংশীরাও কোচদের সমগোত্রীয় বলে ধারনা করা হয়। সেখানকার কোচরা নিজেদের রাজবংশী পরিচয়ে নিজেদের বিলীন করে দিচ্ছে। শেরপুরের কোচরা নিজেদের কোচবিহার রাজার উত্তরসূরি মনে করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ঢাকার কোচরা বর্মন, বংশী, হাজং ও বানাই নামেও পরিচিত। এসব এলাকায় ছোটখাটো অনেক ইতিহাসের অনুসঙ্গ হয়ে আছে কোচ জনগোষ্ঠি। যেমন গোপালপুরের যোগীঘোপা, ধনবাড়ীর ধনপৎ রাজা, ভূঞাপুরের ফলদা রাজবাড়ী, ঘাটাইলের হোড় রাজার ধ্বংসাবশেষ, মধুপুরে শোলাকুড়ি দীঘির খননকারি সামন্তরাজা, ঝিনাইগাতির হরিশচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন কোচ সামন্তপ্রভূদের ঐতিহ্য বলে দাবি করেন গবেষকরা।

কোচরা নিজেদের ক্ষত্রীয় বা যোদ্ধা জাতি পরিচয়ে গর্ববোধ করে। যোগীনি শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে, ক্ষত্রীয় নিধনকারি অত্যাচারি রাজা পরশুরামের ভয়ে অনেক ক্ষত্রীয় মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত বা সঙ্কোচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সংকোচ শব্দের সং বিযুক্ত হয়ে কোচ শব্দের উৎপত্তি ঘটে। ভাষাচার্য

গীয়ার্সন কোচদের ৬টি শাখার কথা বলেছেন। এরা হলো সাহপারি, চাপ্রা, বানাই, তিনটিকিয়া, হরিগাইয়া ও ওয়ানাং। তবে নৃ-গবেষক স্টেপল্টন জানিয়েছেন দিয়াগা ও মারগান নামক আরো দুটো শাখা রয়েছে কোচদের। এসব শাখার মধ্যে আবার শতাধিক নিকনী বা বংশ পদবী রয়েছে। এসব বংশীয় পদবীর মধ্যে স্নাল, চিশিম, রিচিল, দফো, চিরান, হাজং, মুরং পদবী গারোদের মধ্যেও দেখা যায়। কোচদের একই নিকনীতে বিবাহ নিষিদ্ধ। নিকনীর বাইরে মামাতো, চাচাতো, ফুফাতো ও খালাতো ভাইবোনের মধ্যেও বিয়ে চলে না। গারোদের মতো কোচদের মধ্যেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ঘরজামাই প্রথা প্রচলিত ছিল। গারো সমাজে এটি টিকে থাকলেও কোচদের মধ্য কালক্রমে এ প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কোচদের মধ্যে যৌতুক প্রথা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হলেও কোচরা মায়ের গোত্রনাম ব্যবহার করে।

কোচরা হিন্দু ধর্মাবলম্বি হলেও মূল হিন্দুরা এদেরকে ছোটজাত ও অচ্ছুৎ মনে করে। কোচরা দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা ও লক্ষীপূজার পাশাপাশি আদি ধর্মের প্রধান দেবদেবী ঋষী ও যোগমায়ার পূজা করে। দেবী কামাখ্যাও তাদের অতিপূজনীয়। মধুপুর বনাঞ্চলের কোচরা বন দুর্গার পূজা করে থাকে। বড় গাছের ছাল বিশেষ কায়দায় তুলে তাতে দুর্গার প্রতিচ্ছবি আঁকে। সেই প্রতিচ্ছবিতে রংয়ের প্রলেপ দিয়ে বনদুর্গার বিমূর্ত স্পষ্ট করে। তবে মধুপুর বনাঞ্চল উজাড় হওয়ায় এবং বড় গাছপালা সহজে না মেলায় বনদুর্গার পূজা ব্যাহত হয়। কোচদের ভাষার নাম থার। তবে এ ভাষার বর্ণমালা না থাকায় লিখিত রুপ নেই। কথ্য ভাষা হিসাবেই এখন প্রচলিত। ১৯৯১ সালের সরকারি পপুলেশন সেনসাসে দেখানো হয়, সারা বাংলাদেশে মাত্র ১৬ হাজার ৫৫৬জন কোচ বাস করেন। এরমধ্যে টাঙ্গাইলে ৮ হাজার ৪৪৯জন, শেরপুরে ২ হাজার ৫৪৭জন, ময়মনসিংহে ১ হাজার ৭৫৫জন, জামালপুরে ৩ হাজার ৬৩৬জন এবং গোপালগঞ্জে ৩০০জন। আর ২০১১ সালে সরকারি পপুলেশন সেনসাসে মধুপুর উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সংখ্যাকে আরো জঘন্যভাবে তুলে ধরা হয়। সেখানে দেখানো হয়, টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৫৭৫ জন সাঁওতাল, ২ হাজার ৩৬৯জন গারো, ২৮৫জন মারমা এবং ১৫২ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি বাস করে। কোচদের বসবাসের বিষয়টি এখানে বেমালুম অনুল্লেখ থাকে। সবাই জানেন সাঁওতালরা উত্তর বঙ্গের বাসিন্দা। আর মারমারা বৃহত্তর চট্রগ্রামের। কিন্তু তাদেরকে মধুপর বনাঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে দেখানো হয়েছে। যা খুব অবাক করার মতো বিষয় এবং এটি নিশ্চিত ভুল তথ্য।

অপরদিকে মধুপুর বনাঞ্চলে বিদ্যমান প্রায় ১৭ হাজার গারোর সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হয়েছে মাত্র ২৩৬৯জন। বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী সমিতি এবং আদিবাসী গারো সংগঠনগুলো সরকারের এ পপুলেশন সেনসাসকে প্রত্যাখান করে এবং তীব্র নিন্দা জানায়। তারা অভিযোগ করেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির প্রকৃত সংখ্যা সরকারি আমলারা ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে দেখানোর ষড়যন্ত্র করছেন। এটি সংখ্যালঘুদের সাথে এক ধরনের তামাশা। ২০১৫ সালে প্রকাশিত বেসরকারি সংস্থা সেড এর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ "কোচ অব মধুপুর" গ্রন্থে দেখা যায়, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলায় কোচদের খানা সংখ্যা ৭ হাজার ২২১টি। এসব খানায় লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। অপরদিকে বৃহত্তর বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় প্রায় ৭ লক্ষ বর্মন, শিং, সরকার, রাজবংশী ও রায় উপাধিধারি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মানুষ বাস করে। সেডের গবেষণায় বলা হয়, এদের সিংহভাগই কোচ জাতিগোষ্ঠির মানুষ। তবে কোচরা এ এলাকায় রাজবংশী পরিচয়ে নিজেদের বিলীন করে দিচ্ছে। অপরদিকে ওই সংস্থার আরেকটি পৃথক জরীপে বলা হয়, শুধু মাত্র টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার পাহাড়ি ৩০টি গ্রামে ৮৩৩টি খানা বা পরিবারে কোচের সংখ্যা ৩ হাজার ৪২৭জন। আর গারোদের সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার।

কোচজীবন, প্রেক্ষাপট মধুপুর

অপরদিকে মধুপুর বনাঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি কোচ ও গারোদের দারিদ্য বিমোচনে গৃহিত শতকোটি টাকার সরকারি প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে দৃশ্যমান হচ্ছে না। কাঙ্খিত উন্নয়ন না হওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কোচ সম্প্রদায় অন্ধকারেই রয়ে গেছে। অভাব-দারিদ্রতা, অশিক্ষা, রোগব্যাধি তাদের নিত্য সঙ্গী। বেসরকারি সংস্থা সেড প্রকাশিত 'কোচ অব মধুপুর' গ্রন্থে দেখা যায়, মধুপুর উপজেলার পাহাড়ী তিরিশ গ্রামে ৮৩৩ পরিবারে সাড়ে ৩ হাজার কোচের বাস। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাস করেন শোলাকুড়ি ইউনিয়নে। মধুপুরে কোচদের ৮৯% ভুমিহীন।তাদের মধ্যে শিক্ষার হার মাত্র ৪৮.০৫%। মুল পেশা দিনমজুরি। অনেকে বাঁশবেতের কাজ করে। ঘাটাইল, সখিপুর, ফুলবাড়িয়া ও ভালুকা উপজেলার কোচদের আর্থসামাজিক অবস্থা আরো খারাপ। মধুপুর উপজেলার কামারচালা গ্রামের অমূল্য চন্দ্র বর্মন জানান, ৪৭ থেকে ৭৫ পর্যন্ত চার দফা দাঙ্গায় কোচদের অনেকেই ভারতে যায়। কিন্তু ফিরে এসে তারা বাড়িঘর ও জমিজমা ফেরত পায়নি। অনেকের বসতভিটা নেই। বনের খাস জমিতে তারা বসবাস করে।

মধুপুর বনাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি গারো ও কোচ সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির উন্নয়ন কোথাও দৃশ্যমান নয়। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, বিগত সাড়ে তিন দশকে সরকার মধুপুর বনাঞ্চলের ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়ন, পুর্নবাসন এবং দারিদ্রতা বিমোচনে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। প্রথমটি ৮৬ সালে বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার দুইশো কোটি টাকায় ৭ হাজার একরে রাবার প্রকল্প। গজারী বন কেটে সাবাড় করে লাগানো হয় রাবার চারা। ৯৩ সালে বানিজ্যিকভাবে রাবার কষ আহরন শুরু হয়। পীরগাছার সত্যেন কোচ জানান, এখাতে আড়াই হাজার লোকের কর্মসংস্থান হলেও কোচরা একজনও চাকরি পাননি। অথচ রাবার বাগান করার সময় বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ মুহূর্তে কোচ ও গারোদের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে, রাবার বাগান উৎপাদনে গেলে তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকরি পাবে।

মধুপুর বনাঞ্চলে সরকারের দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প ছিল পতিত বনভূমিতে অংশীদারের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন। এ ধরনের বনায়নের মূল কনসেপ্ট ছিল বন এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র মানুষকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন। ৮৯ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণে এ ধরনের বনায়ন শুরু হয়। তারপর বন মন্ত্রনালয়ের ব্যবস্থাপনায় তিন পর্যায়ের প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এখন চতুর্থটি চলছে। তিন দশকে দেশিবিদেশী অর্থায়নে এসব প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। প্রকল্পে উডলট ও এগ্রোফরেষ্ট্রি মডেলের অংশীদারিত্ব বনায়নে স্থানীয় ভূমিহীনদের দুই একর করে বনভূমি বরাদ্দ দেয়া হয়। সরকারি খরচে বৃক্ষচারা রোপনের পর গাছের সারির ফাঁকে ফল ও ফসল আবাদের অনুমতি থাকে। আবাদ করা অর্থকরী ফল-ফসলের পুরোটাই পান অংশীদার। গাছ বড় হলে নীলামে বিক্রির পর আধাআধি হিস্যা বন্টন হয় সরকার ও অংশীদারের মধ্যে। বাংলাদেশ কোচ সমিতির সভাপতি গৌরাঙ্গ কোচ জানান, বনবিভাগ তিন দশকে প্রায় ২০ হাজার অংশীদার বাছাই করে প্রায় ৭ হাজার একরে সামাজিক বনায়ন করেছে। কোচরা এ বনেই উদ্বাস্তু হিসাবে যুগের পর যুগ বাস করলেও তাদের কাউকেই সামাজিক বনায়নের অংশীদার করা হয়নি। সেলামি নিয়ে বহিরাগত ও প্রভাবশালীরা প্লট বরাদ্দ পেয়েছে। তাই বনভূমিতে গাছ আর ফলফসলের মিশেল আবাদে দারিদ্রতা বিমোচনে সরকারি প্রকল্পের সুফল কোচরা পায়নি।

মধুপুর বনাঞ্চলে সরকারের তৃতীয় দারিদ্র

বিমোচন কর্মসূচি হচ্ছে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির উন্নয়ন প্রকল্প।' এটি দেখাশোনা ও বাস্তবায়ন করে স্থানীয় প্রশাসন। ৯৭ সাল থেকে এটি চলমান রয়েছে। বিগত ২৩ বছরে গবাদিপশু বিতরণ, শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, লেট্রিন ও নলকূপ বিতরণ, কালভার্ট নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ বাবদ কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আমলিতলা গ্রামের রাখাল বর্মন জানান, এসব প্রকল্পের কোন দৃশ্যমান উন্নয়ন চোখে পড়েনা। প্রকল্পের আওতায় দোখলা ফরেস্ট অফিস পাড়ায় নির্মিত সাংস্কৃতিক মিলনায়তনটি কোনো কাজে আসছেনা। বিশ হাজার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি গারোকোচের জন্য নির্মিত সাংস্কৃতিক মিলনায়তনটিতে একসাথে পঞ্চাশ জনের অধিক বসতে পারেন না। এ ধরনের প্রকল্পের টাকায় নির্মিত কয়েকটি কালভার্ট দুবছরও টিকেনি। ফলোআপ না থাকায় বিতরন করা গবাদিপশু বেচাবিক্রি করে খেয়েছে দরিদ্র গারো ও কোচরা। সাইনামারি গ্রামের পূর্নিমা বর্মন জানান, কোচ পল্লীতে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। খৃস্টান মিশনারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোচ শিশুদের গারো ভাষায় প্রাকপ্রাথমিকে পড়তে হয়। অভাবঅনটনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডি পার না হতেই কোচ শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। সাইনামারি গ্রামে সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, সেখানকার ৪০ কোচ পরিবারের অনেকের বাড়িতেই পলিথিনে ছাওয়া অস্বাস্থ্যকর খোলা লেট্রিন। সরকারি স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন তাদের কখনো জোটেনি। তিন/চার বাড়ি মিলে একটি নলকূপ। পাড়ায় কমিউনিটি ক্লিনিক নেই। আমাশয়, ডায়রিয়া, টাইফয়েড ও পুষ্টিহীনতা লেগেই থাকে। সরকারি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের তারা নাগালে পায়না। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রসূতি ভাতা শব্দের সাথে তারা পরিচিত নয়। প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বসতঘর কোচরা কখনো পায়নি।

ঘাটাইলের ঘোড়ামারার তিলক চন্দ্র বর্মন কোচ বলেন, তাদের পৈত্রিক রেকর্ডকৃত ও খাজনা প্রদেয় জমি শত্রু সম্পত্তি করে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা লড়ছেন কেউ কেউ। তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালী অসৎ ব্যক্তিগণ জোর করে তাদের অনেক জমির দখল নিয়েছে। কিন্তু তারা বিচার পাচ্ছে না। তিনি বলেন, সরকারের অনেক আর্থিক সহায়তা থেকেই তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোচ সমিতির সভাপতি উষারঞ্জন কোচ জানান, কোচরা হতভাগা জাতিগোষ্ঠির মানুষ। দারিদ্রতা তাদের পিছু ছাড়েনা। তাই তাদের বঞ্চনার মাত্রাও বেশি। তাদের সামাজিক মর্যাদা নেই বললেই চলে। মধুপুর বনাঞ্চলে কোচ ও গারোরা সুপ্রাচীনকাল থেকে এক সাথেই বাস করেন। খৃস্টান মিশনারীদের সৌজন্যে গারোদের শিক্ষার হার প্রায় ৯০%। অর্থনৈতিকভাবেও গারোরা কোচদের থেকে অনেক এগিয়ে। অর্থনৈতিকভাবে ও শিক্ষাদীক্ষায় কোচরা অনেক পিছিয়ে। মধুপুর উপজেলার তিরিশ গ্রাম ঘুরে পাঁচজন এসএসসি কোচ পাওয়া যায় না। ঘাটাইল, সখিপুর, ভালুকা, কালিয়াকৈর উপজেলায় একই অবস্থা দৃশ্যমান। কোচরা মূলত ভূমিহীন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনসহ সার্বিক ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত। মূল ধারার জনগোষ্ঠি এখনো কোচদের ছোটজাত ও অচ্ছুৎ বিবেচনা করায় অনেক রাস্ট্রীয় সুযোগসুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। উল্লেখ্য, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশ কোচ নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দিয়েছে, তবে সংখ্যায় খুবই কম।

সমাজ বিজ্ঞানী ড. আবিদ হাসান জানান, সরকার এমডিজি অর্জন করে প্রশংসিত হয়েছে। এখন এসডিজি অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এসডিজির মূল শ্লোগান 'লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড' কথাটি বাস্তবায়ন করতে হলে পিছিয়ে থাকা কোচ জনগোষ্ঠিকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কিন্তু মধুপুরে সরকারি টাকার উন্নয়ন চোখে না পড়ায় কোচরা হতাশ। কুড়াগাছা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুল হক জানান, কোচরা প্রায় সবাই বনের খাস জমিতে বাস করেন। তাই দরিদ্র হলেও নিয়মানুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ঘর বরাদ্দ তারা পাচ্ছে না। তবে অন্যান্য সুযোগসুবিধা জনসংখ্যা হারে পাচ্ছেন। দোখলা রেঞ্জ অফিসার আব্দুল আহাদ জানান, অতীতে কি হয়েছে জানিনা। তবে এবার থেকে ভূমিহীন কোচদের সামাজিক বনায়নে অংশীদার করা হবে। মধুপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা জহুরা জানান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির উন্নয়ন প্রকল্প থেকে গারো ও কোচদের পাওয়ার টিলার, শিক্ষা উপবৃত্তি ও উপকরণ দেয়া হয়। বিত্তহীন গারোরা ঘর পাচ্ছেন। কোচরাও পর্যায়ক্রমে সরকারি ঘর পাবেন।■

● লেখক : দৈনিক ইত্তেফাকের গোপালপুর সংবাদদাতা, অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক ও গোপালপুর প্রেসক্লাব সভাপতি।

শস্য বহুমূখীকরণ এবং একজন সেলিম শেখের দিন বদল

প্রোফাইল

নাম : মো : সেলিম শেখ (৫৫)
গ্রাম : হাড়িগাছা, নাটোর সদর, নাটোর।
স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েসহ
পরিবারের সদস্য সংখ্যা-৪
প্রথমবার SMAP ঋণ গ্রহণ:
৫০ হাজার টাকা
দ্বিতীয়বার SMAP ঋণ গ্রহণ:
১ লক্ষ টাকা
তৃতীয়বার SMAP ঋণ গ্রহণ:
১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা

নাটোর সদর উপজেলার হাড়িগাছা গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক সেলিম শেখ। কৃষির সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ৪০ বছরের। নিজের ৩ বিঘা জমিই তাঁর জীবিকার উৎস। ২০১৫ সাল পর্যন্ত হাড়িগাছার একজন দরিদ্র কৃষক হিসেবেই পরিচিতি ছিল সেলিম শেখের। চাষাবাদ বলতে ধান, আলু আর কিছু সবজি ফসল– এই দিয়েই কোনো রকমে চলছিল সংসার নামক জীবনচক্র। ততদিনে আশ-পাশের অনেক কৃষকই ধান, আলুর পরিবর্তে পেয়ারা, বড়ই, পেঁপে, কলা জাতীয় ফল-ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য বদলাতে সক্ষম হয়েছেন; কৃষির পরিভাষায় যার নাম শস্য বহুমূখীকরণ। চোখের সামনেই অন্যের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে দেখছেন কিন্তু নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চাষাবাদে পরিবর্তন আনবেন সেই সক্ষমতা নেই সেলিম শেখের। কারণ, ফল-ফসল আবাদে পুঁজির যোগান লাগে বেশি, তাই ২০১৫ পর্যন্ত সাহস হয়নি ৪০ বছরের ছকবাঁধা চাষাবাদের বাইরে নতুন কিছু করার। সেই সময় প্রতিবেশি কৃষকের পরামর্শে বুরো বাংলাদেশ-এর নাটোর সদর শাখায় আসেন যদি কিছু ঋণ পাওয়া যায় এই আশায়।

শাখা ব্যবস্থাপক সব শোনার পর সিদ্ধান্ত নেন সেলিম শেখের পাশে দাঁড়ানোর এবং তাকে SMAP'র সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করে প্রথমবার ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সেলিম শেখের স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী হয় বুরো বাংলাদেশ। প্রায় ৬৫ হাজার টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৭০ শতাংশ জমিতে ৫০০টি থাই পেয়ারার চারা রোপণের মাধ্যমে শুরু হয় শস্য বহুমূখীকরণ কার্যক্রম। প্রথম বছর শেষে ফল সংগ্রহ করেন ১০৫০ কেজি যার বিক্রি মূল্য ৮৪ হাজার টাকা। দ্বিতীয় বছরে ফল সংগ্রহ করেন ৫১০০ কেজি যার বিক্রি মূল্য ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং খরচ বাদেই আয় হয় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আয়ের এই টাকা দিয়ে ক্রয় করেন ২ বিঘা জমি। সেলিম শেখের দিন বদলের যাত্রার শুরুটা এখান থেকেই। সফলভাবে প্রথমবারের ঋণ পরিশোধ করে দ্বিতীয় বার ঋণ নিয়ে পেয়ারার পাশাপাশি নতুন করে ৬০ শতাংশ জমিতে শুরু করেন কলার আবাদ, ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে বছর শেষে নিট মুনাফা করেন ৭৫ হাজার টাকা। সর্বশেষ তৃতীয় বার ঋণ নিয়ে ১ একর জমিতে ২য় বারের মতো কলা চাষে বিনিয়োগ করেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। বর্তমানে তাঁর আবাদকৃত কলার সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং আশা করছেন কলা থেকে তিনি নিট মুনাফা পাবেন ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কলা এবং পেয়ারা থেকে চলতি বছরে ৫ লক্ষ টাকা আয় করার প্রত্যাশা সেলিম শেখের।

বাস্তবায়নের সঠিক পরিকল্পনা ব্যতিত মানুষের মনে বাস করা স্বপ্ন মূল্যহীন। সঠিক পরিকল্পনা এবং ঋণের যথাযথ ব্যবহার যে কোনো মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, একজন সেলিম শেখ তার প্রকৃত উদাহরণ। এরকম হাজারো সেলিম শেখের হাত ধরেই বাংলাদেশের কৃষি আজ এতদূর আর সহজে অর্থ সহায়তা দিয়ে নেপথ্যের কারিগর অবশ্যই বুরো বাংলাদেশ-এর মতো আরো অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

সেলিম শেখের উক্তি "বাবারে, অভাবের সংসারে ইচ্ছা থাকলেও তুমি কখনো ভাল বাবা বা ভাল স্বামী হতে পারবা না, সে তুমি যত ভাল মানুষই হও"– বুঝলাম দিন বদলালেও অভাবের সময়ের জমে থাকা কষ্টগুলো এখনো ভুলতে পারেননি সেলিম শেখ; মানুষ বোধ হয় এরকমই।■

এ বি এম তাজুল ইসলাম
সহকারি কর্মকর্তা-কৃষি

নান্দনিক ও গুণাগুণে ভরপুর
হরপাতা

সৈয়দ মামুনুর রশিদ

টকপাতা বা হরপাতা গাছ কিংবা চুকাই বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় ফলগুলোর একটি। উপগুল্মজাতীয় এ উদ্ভিদের পাতা ও ফল টক স্বাদযুক্ত ও ফল গাঢ় লাল বর্ণের। ইংরেজি নাম Rosella বা Sorrel. এটি অপ্রকৃত ও বিদারী ফল। বৈজ্ঞানিক নাম 'Hibiscus sabdariffa'। বৈজ্ঞানিকভাবে এটিকে ফল বা ফুল বলা হলেও গ্রাম-বাংলায় সবজি হিসেবে বেশ পরিচিত। ভোজনপ্রেমী বাঙালি এটিকে বিভিন্নভাবে খেয়ে থাকেন। চুকাই শুধু ফলই নয়, এর পাতার জনপ্রিয়তাও ফলের মতোই সমান। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি ব্যাপক ভেষজ গুণের অধিকারি। বিভিন্ন রোগ-বালাই নিরাময়সহ সুস্থ থাকার জন্য অতুলনীয় এই ফল ও পাতা। এ গাছের পাতা বা ফল মাছের তরকারিতে দিলে আলাদা স্বাদ ধারণ করে। লাল রংয়ের ফলের বৃন্তগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে চাটনি করেও খাওয়া যায়। শৈশবে আমরা ফলের পার্শ্বস্থ বৃন্তগুলো কাঁচা মরিচের সাথে চাটনি করে খেতাম। পাকলে ফেটে যায় ও বীজ চারদিকে ছড়িয়ে পরে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন– চট্টগ্রামে খরঅগুলা, সিলেটে হইলফা, খুলনায় অম্বলমধু, ঢাকা ও মানিকগঞ্জে চুকুল, কুমিল্লায় মেডস নামে পরিচিত। এছাড়া চুকুর, চুকা চুকিকা, টেঙ্গাপাতা, চুকাপাতা ইত্যাদি নামেও পরিচিত। দেশে বিদেশে সবজি হিসেবে এর চাহিদা রয়েছে। মিয়ানমারের সবচেয়ে জনপ্রিয় সবজিগুলোর একটি চুকাই।

চুকাই ফল ও পাতা দিয়ে তৈরী করা ভর্তা ও শাক গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ। আবার চিংড়ি মাছ, শোল মাছ, ট্যাংড়া মাছ, পুঁটি মাছ দিয়ে এর ঝোল যে কোন ভোজনপ্রেমী মানুষ একবার খেলে দীর্ঘদিন মুখে লেগে থাকবে। অনেকে গরু কিংবা খাসির মাংসের সাথেও চুকাই পাতা ও ফল ব্যবহার করে থাকেন। এটা খাবারের স্বাদ আরও বাড়িয়ে তোলে। এ গাছটি বাসার বারান্দায় বা ছাদে কাটা ড্রাম/বালতিতে সহজে চাষ করা যায়। এতে করে বাসার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি রান্নাবান্নায় ব্যবহার করা যায়, বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। আমাদের একটু সুদৃষ্টি, খেয়াল বা যত্ন বিলুপ্তপ্রায় এই গাছটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ফলের বাণিজ্যিক চাষ হলেও বাংলাদেশে হয় না। অনেক অঞ্চল থেকে এটি এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক সময় প্রতিটি গ্রামেই চুকাই ফলের গাছ দেখা গেলেও, এখন পাওয়া যায় না। তবে হবিগঞ্জের মাধবপুর, চুনারুঘাট ও বাহুবলের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় এই চুকাই গাছ রয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে চাষ না হলেও পাহাড়ি এলাকার প্রায় বাড়িতেই এই গাছ পাওয়া যায়।

টক স্বাদের কারণে জ্যাম, জেলি ও আচার তৈরিতে এই ফল ব্যবহার করা হয়। দেশে, বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে এর পাতা ও ফল দিয়ে টক বা খাট্টা রান্না করে খাওয়া হয়। এর

মধ্য 'পেকটিন' আছে বলে জ্যাম তৈরিতে আলাদাভাবে পেকটিন মেশাতে হয় না। অস্ট্রেলিয়া, বার্মা, ত্রিনিদাদে জ্যাম তৈরিতে ব্যাপকভাবে এই ফলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই গাছের আঁশকে পাটের আঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। চুকাই এর বীজ থেকে ২০% ভোজ্যতেল উৎপাদন করা যায়।

উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞদের মতে, সমতল ভূমির চেয়ে পাহাড়ি এলাকায় এই গাছ বেশি জন্মায়। তাছাড়া এই ফলটি পাহাড়িদের জনপ্রিয় খাবার। যার ফলে পাহাড়ে বসবাস করা বিভিন্ন জাতি এই ফলটি নিজেদের আঙিনা বা বাড়ির আশপাশে রোপণ করে থাকে। পাট জাতীয় এই ফলটি দিয়ে বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু খাবার তৈরী করেন পাহাড়ি অধিবাসীরা। আবার সমতল ভূমির লোকদের কাছেও কম জনপ্রিয় নয় এটি। বাণিজ্যিকভাবে চাষ করলে সম্ভাবনাময় একটি খাতে পরিণত হতে পারে এই চুকাই। চুকাই দিয়ে উৎপাদিত চা, জ্যাম, জেলি, জুস, আচার ইত্যাদি বাজারজাত করা গেলে পাল্টে যাবে দেশের অর্থনীতির চিত্র। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে এই শিল্পের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে, খাবার ও সম্ভাবনাময় শিল্পের এই চুকাই ভেষজ উদ্ভিদ হওয়ায় এর স্বাস্থ্য উপকারিতাও অনেক। পুষ্টিবিদদের মতে, চুকাই দিয়ে যেকোন খাবার অন্যসব খাবারের তুলনায় অধিক পুষ্টি সম্বলিত। এক সময় চুকাই গাছ কবিরাজি ওষুধ হিসেবে ব্যাপক ব্যবহৃত হতো। চুকাই ফল ও পাতা উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া মূত্রবর্ধক, মৃদু কোষ্ঠ-নরমকারী, হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় এই ফলের ভূমিকা অপরিসীম। চুকাই পাতা ও ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, কেরোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান রয়েছে। ইতালি, আফ্রিকা, থাইল্যান্ডে চুকাই পাতার ভেষজ চা খাওয়া হয়।

বাংলাদেশের অনেক আদিবাসীদের মধ্যে চুকাই টক ঢ্যাঁড়স নামে পরিচিত। শীতে জিভ ও মুখের অভ্যন্তর এবং দুই ঠোঁটের কোনে যে ঘাঁ হয় তার প্রকোপ আদিবাসীদের মধ্যে অনেক কম লক্ষ করা যায়। এর কারণ এই টক ঢ্যাঁড়শ বা চুকাই। লোধা সম্প্রদায়ের মানুষেরা সামান্য নুনসহ এর পাতা– ফোটানো জল কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসায় ব্যবহার করেন। চর্ম রোগ হলে এই ফলের বীজ সরষের তেলে ফুটিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগান তারা। সাঁওতাল সম্প্রদায় হাড় ভেঙে গেলে এর পাতা বেটে নিয়মিত প্রলেপ লাগায়। মূত্রকৃচ্ছতায় গোলমরিচসহ পাতার রস খাওয়ানো হয়। অন্ত্রে কৃমির উপদ্রপ হলে বীজচূর্ণ খাওয়ানো হয়। পূর্ব-ভারতে ও বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, বেলে দোঁয়াশ ও পলিমাটিতে টকঢ্যাঁড়স খুব ভালো জন্মায়।

চুকাই-এর আদি নিবাস দক্ষিণ আফ্রিকা। আগেই বলেছি, আমাদের দেশে এর প্রাচুর্য ছিলো এক সময়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে কিংবা আমাদের অবহেলায় টিকে থাকতে পারেনি। এর যতটুকু অস্তিত্ব এখনও আছে তা বিলুপ্তির কাছাকাছি বলা যায়। কিন্ত এখনও সম্ভব এই ভেষজ ও নান্দনিক উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখা।

লেখক : ব্যবস্থাপক, প্রশাসন, ঘাসফুল
তথ্য : সংগৃহীত

আলোকচিত্রে টাঙ্গাইলের বধ্যভূমি

দীর্ঘদিন অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে থাকা টাঙ্গাইলের বধ্যভূমিটি বহু প্রাণের আত্মত্যাগের স্মৃতিবিজড়িত এক প্রদীপ্ত পুণ্যভূমি। তবে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও চিত্রশিল্পী শরাফত খানের নকশায় নবনির্মিত এই স্থাপনাটি আজ রূপ নিয়েছে সত্যিকারের স্মৃতির মিনারে। শুধু নান্দনিকতাই নয়, এই বধ্যভূমি পর্যটনে যে কারো সামনেই উঁকি দেবে একাত্তরে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মমতার অব্যক্ত কাহিনী। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পঠিত হবে মৃতের ভাগাড় থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের জেগে উঠার ইতিহাস।

জল্লাদখানা থেকে তুলে এনে
আমাকে ফেলে রাখা হয়েছিলো
জীবন নেভানো সেই মৃতের ভাগাড়ে
তবু কি আশ্চর্য!
আমার নিশপিশ করা
আঙ্গুলগুলো দিয়ে
হাওয়ায় হাওয়ায় একটু একটু করে
রচিত হচ্ছিল বাংলাদেশ।
(বধ্যভূমি থেকে, জাহিদ মুস্তাফা)

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

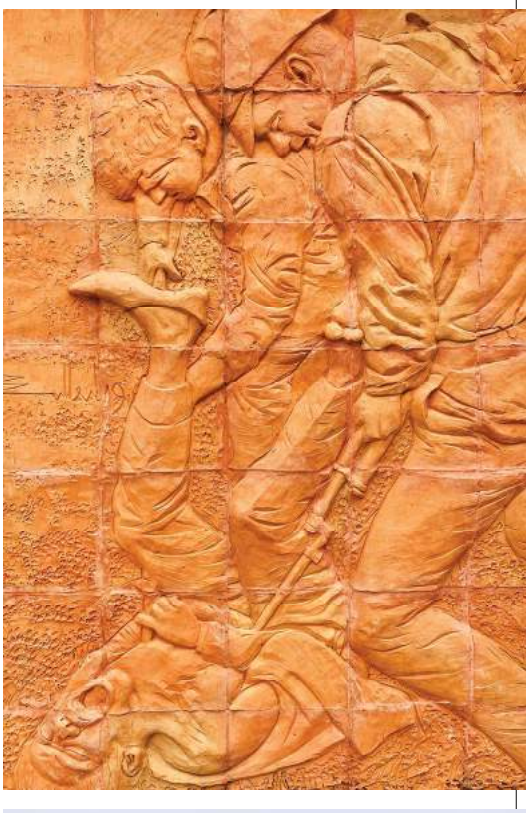

জয়নব বেগমের সাফল্যের গল্প

শরীফ হাসান চৌধুরী

দারিদ্রের কষাঘাতে খুব কষ্টে দিনগুলো অতিবাহিত করছিলেন জয়নব বেগম। আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতই তার স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করার। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। আজ থেকে ১৮ বছর আগে ২০০২ সালে অল্প বয়সে বিয়ে হয় দিনমজুর রমজান আলীর সাথে। নিজের বলতে কোন জায়গা জমি ছিল না। সমতল থেকে প্রায় ১০০ ফুট উপরে পাহাড়ে বসবাস তাদের। ভূমিহীন হওয়ায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার গিলাতলী সরকারি আদর্শ গ্রামে ঝুপড়ি ঘরে দিনমজুর স্বামী, ২ ছেলে ও ১ মেয়েসহ ৫ জনের অভাব অনটনের সংসার।

কয়েক বছর আগেও জয়নব বেগমের ঘরে খাবার ছিল না, ছিল না বেঁচে থাকার মৌলিক সুবিধা। ছিল না স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা। পাহাড় বেয়ে অনেক দূর থেকে খাবার পানি বয়ে আনতে হতো। অস্বাস্থ্যকর ও খোলা আকাশে অথবা ঝোপঝাড়ে প্রকৃতির কাজ সারতে হতো। ফলে পরিবারের সদস্যদের অসুখ বিসুখ লেগেই থাকতো। এমন অবস্থায় জয়নব বেগমের ছেলে মেয়েদের নিয়ে বড় কোন স্বপ্ন দেখার সুযোগ ছিল না।

জয়নব বেগমের ৫ সদস্যের সংসারের ঘানিটানা স্বামীর একার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। সিদ্ধান্ত নিলেন স্বামীর পাশাপাশি তিনি নিজেও কিছু একটা করবেন। দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ নিলেন নার্সারিতে। আগে থেকেই জানতেন জাল বুনন ও কাঁথা সেলাই এর কাজ।

২০১৩ সালে ঋণের জন্য যোগাযোগ করলেন বুরো বাংলাদেশের কেরানী হাট শাখায়। সে যাত্রায় ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগী, ছাগল পালন এবং পাশাপাশি কাঁথা সেলাই ও জাল বুননের কাজ শুরু করলেন। তিল তিল করে গড়ে তুললেন স্বপ্নের বীজ। কয়েক বছরের মধ্যে আয় রোজগার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এখন তিনি প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৫ হাজার টাকা আয় করেন। প্রথম ঋণের টাকা পরিশোধ করলেন। এরপর আবারও বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নেন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। বুরো বাংলাদেশের কেরানী হাট শাখার কেন্দ্রের নিয়মিত সদস্য জয়নব বেগম।

২০১৬ সালে বুরো বাংলাদেশ থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋণ এবং নিজের জমানো টাকা দিয়ে দিনমজুর স্বামীকে বিদেশ পাঠান। তিনি এখন বিদেশ থেকে নিয়মিত টাকা পাঠান। ছেলে মেয়েদের পাশের গ্রামের স্কুলে দিয়েছেন। একটু একটু করে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে উদ্যোগী হন। এরই মধ্যে একদিন কেন্দ্রে আগত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলেন। সভায় জানতে পারেন, বুরো বাংলাদেশ সদস্যদের নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের জন্য স্থাপনা তৈরি করতে ঋণ প্রদান করে থাকে। পরিবারকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে স্বামীর পাঠানো টাকা এবং নিজের জমানো টাকা দিয়ে প্রথমে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন করেন।

এরপর নলকূপ স্থাপনের জন্য বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নলকূপ বসিয়ে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করছেন। যার দরুন জয়নব বেগমের পরিবারে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুবিধা নিশ্চিত হয়। এখন আর তাকে দূরে থেকে পানি আনতে হয় না। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে তার পরিবার।

আজ জয়নব বেগমের পারিবারে অভাব দূর হয়েছে। একদিকে যেমন প্রায় সকল মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত হয়েছে। তেমনি অন্যদিকে ছেলে মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। সামাজিকভাবে জয়নব বেগমের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশি ও সমাজের কাছে তার সংগ্রামী সাফল্যের গল্প তাকে অনন্য মর্যাদা এনে দিয়েছে। জয়নব বেগম চোখেমুখে সাফল্যের হাসি নিয়ে এখন আরও বড় স্বপ্ন দেখেন। বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে সে বর্তমানে স্বাবলম্বী। তার পরিবারের সবাই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানি ব্যবহার করেন এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলেন।■

● প্রকল্প মনিটর (ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প)
বুরো বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম বিভাগ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের ওয়াটার ক্রেডিট প্রোগ্রাম পরিদর্শন

গত ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব মো. রাশেদুল ইসলাম টাঙ্গাইল অঞ্চলে বুরো বাংলাদেশ এর ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করে সংস্থার কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়-কালে তিনি বুরো বাংলাদেশ-এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরিদর্শন-এর সময় সংস্থার টাঙ্গাইল বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, টাঙ্গাইল অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা-হেলথ এন্ড হাইজিন, মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ইনচার্জসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বুরো বাংলাদেশ ২০১৪ সাল থেকে এর সদস্যদের জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ৬১টি জেলার ১০১২টি শাখার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ ও তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে বুরো বাংলাদেশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ' শীর্ষক ১৮ দিনব্যাপী এই কোর্স বুরো'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একাধিক ব্যাচে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হবে। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক অংশে বিভক্ত এই কোর্সগুলো পরিচালনা করছেন সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষকবৃন্দ।

Microcredit Regulatory Authority

এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. ফসিউল্লাহ। এর আগে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) পদ থেকে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) ছিলেন। তাঁকে এ পদে তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের কৃতি সন্তান মো. ফসিউল্লাহর জন্ম ১৯৬১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গফরগাঁও উপজেলার হাটখোলা গ্রামে। তাঁর পিতা মরহুম মো. আক্কাস আলী এবং মা সুফিয়া বেগম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, সিডা, সেভ দ্যা চিলড্রেন, জাইকা, ইইউ, ব্রিটিশ কাউন্সিল, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, ডিএফআইডি, ইউএস এইড, অস এইড, কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক এবং ইউএনএইচসিআর এর কার্যক্রমের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন।

বুরো বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়ে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ও বুরো বাংলাদেশ এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদা চাষীদের ঋণ সহায়তা বিষয়ক এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রূপালী ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার মো. মুজিবুর রহমান, ডিজিএম জেবু সুলতানা, এসপিও আলমগীর হোসেন, প্রিন্সিপাল অফিসার মিজানুর রহমান এবং বুরো বাংলাদেশ এর পক্ষে এম. মোশাররফ হোসেন– পরিচালক (অর্থ), খন্দকার মোখলেসুর রহমান– কোঅর্ডিনেটর (কর্মসূচি), মো. আবদুল হালিম– কোঅর্ডিনেটর (ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) এবং এবিএম তাজুল ইসলাম– সহকারী কর্মকর্তা (কৃষি)। চলতি মৌসুমে রূপালী ব্যাংক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদা চাষীদের বুরো বাংলাদেশ এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান করবে।

বুরো বাংলাদেশ এবং মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের মধ্যে মাইক্রোক্রেডিট সিকিউরিটাইজেশন ফর বুরো বাংলাদেশ বিষয়ক এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হোলসেল ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রধান কামরুল হাসান খান, ইউনিট প্রধান (সিবিইউ) আশরাফ উর রহমান চৌধুরী, স্ট্রাকচারাল ফাইন্যান্স ইউনিট প্রধান এহতেশাম রহমান, হোলসেল ব্যাংকিং ডিভিশনের সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার জুবায়ের রেজা, স্ট্রাকচারাল ফিন্যান্স ইউনিট এর সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার নাজিয়াত জহিরা কাজী। বুরো বাংলাদেশ এর পক্ষে ছিলেন এম. মোশাররফ হোসেন– পরিচালক (অর্থ), ফারমিনা হোসেন– অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশনস), মো. আবদুল হালিম– কোঅর্ডিনেটর (ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) এবং এবিএম আমিনুল করিম মজুমদার– কোঅর্ডিনেটর (ইন্টারনাল অডিট)।

'বেস্ট প্রেজেন্টেড অ্যানুয়াল রিপোর্ট' এর জন্য বুরো বাংলাদেশ ICAB সম্মাননা ২০১৯ লাভ করেছে। দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (ICAB) NGO ক্যাটাগরিতে এই সম্মাননা প্রদান করে। সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির কাছ থেকে বুরো বাংলাদেশ এর পক্ষে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন অর্থ ও হিসাব বিভাগের সমন্বয়কারী মো. আব্দুল হালিম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য সচিব ড. জাফর উদ্দীন এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ হামিদ উল্যাহ ভূঁইয়া।

বুরো বাংলাদেশ যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্থানীয় স্মৃতিসৌধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। তবে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর কারণে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বছর সীমিত পরিসরে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

Institute for Inclusive Finance and Development (InM) পরিচালিত Diploma in Microfinance-এর ১০ম ব্যাচে সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট অর্জন করে বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলী রেজা Chairman's Gold Medal লাভ করেন। এছাড়া এই কোর্সে বুরো বাংলাদেশ থেকে নার্গিস ইসলাম, ফাহমিদা খানম ও মো. মোরশেদুল হকসহ আরো ১৪টি প্রতিষ্ঠানের ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বুরো বাংলাদেশ যশোর অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে যশোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. তমিজুল ইসলাম খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. রফিকুল হাসান, এবং বুরো বাংলাদেশ খুলনা বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মীর মুকুল হোসেন, যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আল আমিন খান, ফরিদপুর মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ইনচার্জ কামাল আহমেদ ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুলের আইসিএবি ও সাফা অ্যাওয়ার্ড অর্জন

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ২০১৯ সালে সেরা অ্যানুয়েল রিপোর্ট এর জন্য দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর এনজিও ক্যাটাগরিতে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য সচিব ড. জাফর উদ্দীন এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ হামিদ উল্যাহ ভূঁইয়া। ঘাসফুলের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

ইপসা'র বোট র‍্যালি

শিপব্রেকিং শিল্পে সুরক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য ইয়ং পাওয়ার ইন স্যোসাল অ্যাকশন (ইপসা) গত ২৮ ডিসেম্বর '২০ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার উপকূলে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের পাশাপাশি সীতাকুন্ড চ্যানেলে সেফটি ফার্স্ট নামে ব্যতিক্রমী বোট র‍্যালির আয়োজন করে। কুমিরা থেকে শুরু করে ভাটিয়ারী এলাকায় টহলরত এই র‍্যালিতে ১০টি নৌকায় মোট ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক যাত্রী ছিলেন।

র‍্যালীর উদ্বোধন করেন ইপসা'র প্রকল্প সমন্বয়ক মুহাম্মদ আলী শাহিন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, বেশিরভাগ শিপ রিসাইক্লার কাজ করার সময় সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করছেন না এবং শ্রমিকরাও সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব বেশি প্রশিক্ষিত নন। অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর হতাহতের পরিমাণ কম ছিলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন ইয়ার্ডে তিনজন শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ইয়ার্ডগুলোতে সুরক্ষা জোরদার করতে এবং সকলের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

ইপসা'র প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান জানান, শিপব্রেকিং শিল্পে সুরক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ইপসা'র খাদ্য উপহার কর্মসূচি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য ইপসা'র উদ্যোগে কোভিড-১৯ এ কর্মহীন শ্রমিক, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের দরিদ্র শ্রমিক, আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, জেলেসহ ৫০০০ দুঃস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার বিতরণ করা হয়েছে ।

সীতাকুণ্ড উপজেলার নির্বাহী অফিসার মিল্টন রায় এবং সম্মানিত ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের পরামর্শ এবং সহযোগিতায় গত ১৭ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত উপজেলার দশটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ম্যান অব দ্যা ইয়ার আজহার আলী তালুকদার

ডর্প'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বেসরকারি সংস্থা ডর্প এর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা রাজধানীর শেওড়াপাড়ায় সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

ডর্প এর চেয়ারম্যান মো. আজহার আলী তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন ডর্প উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের পরিচালক মো. জুলফিকার হায়দার।

অনুষ্ঠানে সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও ডর্প এর চেয়ারম্যান মো. আজহার আলী তালুকদারকে 'ডর্প ম্যান অব দ্যা ইয়ার-২০২০ সম্মাননা দেয়া হয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ওয়াশ সেক্টরের আব্দুল হামিদ ফারুক, পুনর্বাসন কার্যক্রমের জাকির হোসেন, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কামরুন্নাহারকে 'ডর্প সেরা কর্মী ২০২০' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কুমিল্লায় আইনগত সহায়তা বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা

১১ জানুয়ারি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, কুমিল্লা এবং এইড-কুমিল্লার যৌথ আয়োজনে ইউএসএইড'র প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস (পিপিজে) এ্যাকটিভিটির অর্থায়নে বাগমারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, লালমাই, কুমিল্লায় "সরকারি আইনগত সহায়তা গরিব মানুষের জন্য কল্যাণকর" বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২১ আয়োজন করা হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন লালমাই কুমিল্লার বাগমারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সালমা আক্তার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) এবং জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্য সচিব ফারহানা লোকমান।

চট্টগ্রামে বিশ্ব শিশু দিবস ২০২০ পালিত

'শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু আধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে গত ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম এর আয়োজনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর সহযোগিতায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ জেড এম শরীফ হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী ও ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নারগিস সুলতানা। মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সমাজসেবা কর্মকর্তা পারুমা বেগম, বিবিএফ এর প্রধান নির্বাহী উৎপল বড়ুয়া, ভোরের আলোর প্রধান মো. শফিকুল ইসলাম খান, সংবাদিক রনজিৎ কুমার শীল, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, সংশপ্তকের উপপরিচালক অগ্রদূৎ দাশগুপ্ত ও ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চলে গেলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদ

সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত, মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান, টাঙ্গাইল মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর এর প্রতিষ্ঠাতা, বুরো বাংলাদেশ এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ও প্রাক্তন গভর্নিং বডি সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদ গত ১০ ডিসেম্বর ২০২০ ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনী তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বনানী সামরিক কবরস্থানে সমাহিত করে।

আনোয়ার উল আলম শহীদ ১৯৪৭ সালে টাঙ্গাইল শহরের থানা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বুরো বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনসহ বুরো পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

আনোয়ার উল আলম শহীদ এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় গত ১৬ জানুয়ারি ২০২১ বুরো বাংলাদেশ এক ভার্চুয়াল স্মরণ সভার আয়োজন করে।

বুরো বাংলাদেশ এর গভর্নিং বডির সাবেক চেয়ারপার্সন এস কে সরকারের সভাপতিত্বে সূচনা বক্তব্য রাখেন বুরো বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। আলোচনায় অংশ নেন সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সেনা প্রধান লেফটেনেন্ট জেনারেল মো. হারুন অর রশিদ (বীর প্রতীক), দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ট্রাস্টি ড. সরোয়ার আলী, সাংবাদিক, লেখক ও সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মহাসচিব হারুন হাবীব, কবি মাহবুব সাদিক, সাবেক সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেন, সাবেক সচিব হুমায়ুন খালিদ, বুরো বাংলাদেশ এর অর্থ পরিচালক এম. মোশাররফ হোসেন, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ঢাকার সাধারণ সম্পাদক মো. মনছুরুল আলম হীরা, ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম এর মহাসচিব রাশেদুল হাসান শেলী, টাঙ্গাইল জেলা সমিতির সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন বাবলু ও প্রত্যয় সম্পাদক ফেরদৌস সালাম।

টাঙ্গাইল থেকে যুক্ত হন আইনজীবী ও সম্পাদক খান মোহাম্মদ খালেদ, সাধারণ গ্রন্থাগার টাঙ্গাইল এর সহসভাপতি খন্দকার নাজিম উদ্দিন, কবি মাহমুদ কামালসহ আরো অনেকে।

মরহুমের জীবনালেখ্য বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন প্রত্যয় এর নির্বাহী সম্পাদক বিদ্যুত খোশনবীশ।

কর্মজীবনে আনোয়ার উল আলম শহীদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বাহরাইন ও স্পেনে। তাছাড়া কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই ও হংকং-এ।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি এবং একই সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও স্বজনদের প্রতি বুরো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

করোনা মোকাবেলায় প্রত্যাশী'র কার্যক্রম

উন্নয়ন সংগঠন প্রত্যাশী করোনা মোকাবেলায় বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের লক্ষণ এবং সংক্রমিত হলে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে সংস্থার উপকারভোগী ও কর্ম-এলাকার জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করে।

সংস্থার কর্ম-এলাকার জনসাধারণ বিশেষ করে সংস্থার চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফলভোগীদের যথাযথভাবে হাত ধোয়ার প্রক্রিয়া ও ভাইরাস প্রতিরোধে গ্রুপ পর্যায়ে হাত ধোয়া কর্মসূচি এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

সংস্থার ৭ টি জেলায় (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী) মাইক্রোফাইনান্স কার্যক্রমসহ চলমান অন্যান্য কর্মসুচির অতিদরিদ্র ১১ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। প্রতি পরিবারের জন্য ১০ কেজি চাল, ৬ কেজি আলু, ২ কেজি ডাল, ১ কেজি তেল ও ১ কেজি পেঁয়াজ দেয়া হচ্ছে। এতে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় ৩০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে এক লক্ষ সাত হাজার টাকা খরচ করা হয়।

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা IoM-এর লাইভলিহুড প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় ৭৪৫টি পরিবারকে বাইশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নগদ অনুদান প্রদান করা হয়।

কাদাকনাথ- কুচকুচে কালো প্রজাতির মুরগি। বাংলাদেশে এসেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশ থেকে। আদি উৎস ইন্দোনেশিয়া। ডিম ছাড়া এ মুরগির সবই কালো। গড় ওজন দেড় থেকে দুই কেজি। প্রতি কেজি হাজার টাকা। ডিম ২'শ টাকা হালি। রংপুরের মাস্টার পাড়ায় এই বিরল প্রজাতির মুরগি পালন করেন শিরিন আক্তার ও তার স্বামী মোস্তাক আহমেদ। বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন মুরগি ও ডিম বিক্রি করে। ২২ শতাংশ জমিতে উন্নত ড্রাগন ফলের চাষও করেন তারা; স্বপ্ন দেখেন এই ফার্ম ও বাগান আরো বড় করার। শিরিন ও মোস্তাকের সেই স্বপ্ন পূরণে পাশে দাঁড়িয়েছে বুরো বাংলাদেশ।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

BURO
Bangladesh

WE SUPPORT
DREAMS
THAT ASPIRE
BIGGER
DREAMS

Microfinance:
Creating Opportunities

Phone: 880-2-9861202, 880-2-9884833, FAX : 880-2-9884832, 880-2-9858447
Email: buro@burobd.org zakir@burobd.org Web: www.burobd.org